আবদুস্ সাত্তার

আধুনিক আরবী গল্প

bengaliboi.com

আধুনিক আরবী গল্প

আবদুস্ সাত্তার

মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

প্রকাশ করেছেন ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছেদ এঁকেছেন ঃ
আবুল বারক আলভী

ছেপেছেন ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

মূল্য ছয় টাকা
স্বঃ গ্রন্থকার

ADHUNIK AARBI GALPA
(Modern Arabic Short-Stories)
Translated By Abdus Sattar
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashgonj
Dacca—1
Bangladesh.
Price Taka 6·00

সৈয়দ আলী আহসান

কবীর চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আবদুস্ সাত্তার-এর অন্যান্য গ্রন্থ

বৃষ্টিমুখর (কবিতা)
অন্তরঙ্গ ধ্বনি (কবিতা)
আমার ঘর নিজের বাড়ী (কবিতা)
নামের মৌমাছি (ট্রিওলেট কবিতা)
পিতার প্রতিকৃতি (কবিতা)
আরবী কবিতা (অনুবাদ)
বালি ও ফেনা (অনুবাদ/আরবী কবিতা)
আরণ্য জনপদে (গবেষণা)
আরণ্য সংস্কৃতি (গবেষণা)
বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি (গবেষণা)
আধুনিক আরবী সাহিত্য (গবেষণা)
উপজাতীয় ভাষা ও সাহিত্য (গবেষণা)
মোমেনশাহীর জারি গান (গবেষণা)
In the Sylvan Shadows (Research)
The Sowing of Seeds (Research)
Tribal Culture in Bangladesh (Research)
The Chakmas (Research)
আরণ্য-প্রেম (গবেষণা)

সূচীপত্র

ভূমিকা/৭
আমার কথা/১৪

মাহমুদ তাইমুর/মৃত্যু/১৭
জুননুন আইয়ূব/অভিপ্রায়/২৭
নাজীব মাহফুজ/পাগল/৪৭
ইউসূফ আল-সাবায়য়ী/ঘরেফেরা/৫৫
ইউসূফ শারোনী/দারাইব গলি/৭০
ইউসূফ ইদ্‌রীস্/দায়িত্ব/৭৮
ইদরীস শা'রাবী/তীর্থযাত্রা/৯৬
লেখক-পরিচিতি/১০৫

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.bengaliboi.com

Click here

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধই আধুনিক আরবী সাহিত্যের সূচনা কাল এবং আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় 'আন-নাহদা' বা রেনেসাঁ যুগ। এই সময়ে শিল্পবিবর্তনের ফলে নতুন ধরনের গদ্যরীতি আরবী সাহিত্যে আশ্রয়লাভ করে, এ কারণেই রচিত হতে থাকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের ছোটগল্প যা ইতিপূর্বে আরবী সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

অবশ্যি, অষ্টম শতাব্দীর ইবন আল্ মুকাফ্ফা (মৃঃ ৭৬০ খ্রীঃ) রচিত 'কালিলা ওয়া দিমনা' এবং দশম শতাব্দীর 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'ও যে আধুনিক আরবী গল্পে প্রভাব বিস্তার করেনি এমন কথা বলা যায় না। তবে এসব ক্লাসিকধর্মী রচনার সঙ্গে আধুনিক কালের ছোটগল্পের তফাৎ শুধু আঙ্গিক গঠনে সীমাবদ্ধ নয়; টেকনিক, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গী এবং ভাষা ও শব্দচয়নেও প্রচুর তফাৎ নজরে পড়ে।

নতুন আঙ্গিকের গদ্য-শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেমন এগিয়ে আসলেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা তেমনি তাঁদের পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করলো কয়েকটি উন্নতমানের পত্র-পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে 'বুতরুস্ আল্-বুস্তানী' (১৮১৯-১৮৮৩) সম্পাদিত 'আল্-জিনান', আহমদ লুতফী আল্ সায়্যীদ সম্পাদিত 'আল্-জারিদা', মাহমুদ হাসান হায়কল সম্পাদিত 'আল্ সিয়াসা', রাজ্জাক গান্নাম সম্পাদিত 'আল্ ইরাক', জুরজী জায়দান সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত 'আল্-হেলাল' এবং ইয়াকুব সারুফ সম্পাদিত ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত 'আল্-মুকতাতিফ' প্রভৃতির নাম করা যায়। আধুনিক গদ্যরীতির শিল্পবিন্যাসে এসব পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক টেকনিকে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় যাঁরা সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার সালীম আল্‌বুসতানী (১৮৪৮-১৮৮৪), বিখ্যাত সমাজসংস্কারক জামাল-উদ্দীন আল্‌-আফগানীর অন্যতম শিষ্য মিশরের মুহম্মদ আবদুহ্‌ (১৯০৫), লেবাননের খৃষ্টান দার্শনিক কবি জীবরান খলীল জীবরান (১৮৮৩—১৯৩১), মিশরের মুসতাফা লুৎফী আল-মুনফালুতী (১৮৭৬-১৯২৪), সিরিয়ার খৃষ্টান লেখক জুরজী জায়দান (১৮৯১-১৯২৪), লেবাননের সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সায়্যীদ আল-বুসতানী (১৮৫২-১৯২৭) এবং ইয়াকুব সারুফ (১৮৫২-১৯২৭), সিরিয়ার ফারাহ্‌ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২), ইরাকের ইবরাহীম হিলমী আল্‌-উমর (১৮৯৫-১৯৪১) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত কথাশিল্পীদেরকে রেনেসাঁ আন্দোলন বা আধুনিক কথা-সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং এঁরা সবাই প্রথমতঃ ছোটগল্প এবং পরে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এঁদের রচনায় ফরাসী ও রুশীয় সাহিত্যের প্রভাব পড়লেও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এঁরা স্বকীয়তা অর্জন করেন। ফলে কিছু সংখ্যক মননশীল রচনা সার্বজনীনতার জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এঁদের মধ্যে মিশরের মুসতাফা লুৎফী আল্‌ মুনফালুতীর ছোটগল্প সংকলন 'আল্‌ আবরাত' (অশ্রু), 'আল্‌-নাজারাত' (দৃষ্টি) প্রভৃতি আধুনিক আরবী গল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

উপরোক্ত কথাশিল্পীদের পরপরই আধুনিক আরবীসাহিত্য ক্ষেত্রে আর একদল কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব আরবী কথা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধির দিকে পৌঁছে দিল। এঁদেরকে আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা যায়। এই দলে যাঁরা বিশেষ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যকর্ম পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন মুবা এলাহী, আয়েশা তাইমুর, মোহাম্মদ তাইমুর, তাহা হোসেন, তাওফীক আল্‌-হাকীম, মাহমুদ তাইমুর, ঈসা আবিদ, সাহাতা আবিদ, তাহির লাশিন, মোহাম্মদ আহমদ, আনোয়ার শাউল, আবদ আল্‌ মাসিহ হাদ্দাদ, আমিন হাস্নুনা, ইবরাহীম মাসরী, আবদুল কাদের আল্‌ মাজিনী, নাজীব

মাহফুজ, আবদুল হামিদ জুদা সাহাব, আবদুল হালিম, আবদুল্লাহ্ আলী আহমদ বাকাসীর, আমিন ইউসুফ গুরমে, মাহমুদ আল-বাদায়ী, নাজীর আল-আকিকী, ইউসুফ সাবায়য়ী, আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্ সাহার, জুননুন আল আইয়ুব, ফাহিমী আল-মুদাররীস্, ইবরাহীম সালিহ্ শাকুর, হিকমাত সুলায়মান, আবদ-আল ফাত্তাহ্ ইবরাহীম, জাফর আল খলিলী, আবদ আল মজীদ লুৎফী প্রমুখ।

কায়রোর মুবা এলাহী (১৮৭০—১৯৩০), আয়েশা তাইমুর (১৮৪০—১৯০২), মোহাম্মদ তাইমুর (১৮৯২—১৯২১) এই তিন প্রতিভাদীপ্ত কথাশিল্পী ছোটগল্প রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুবা এলাহীর ছোটগল্প সংকলন 'কাসাসুল ঈসা বিন হিসাম' (হিসামের পুত্র ঈসার গল্প) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হলেও গল্পের টেকনিক আয়ত্ত করা হয়েছে প্রাচীনপন্থী 'মাকামাত' কিংবা 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' থেকে। অনুরূপভাবে আয়েশা তাইমুরও প্রাচীন ধারার 'মাকামাত' থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। তবে তাঁর গল্পে মুসলিম ঐতিহ্য ও সামাজিক চিত্র লক্ষ্য করবার মতো।

আয়েশা তাইমুর লিরিকধর্মী কবিতা ও 'মর্সিয়া' লিখেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। মোহাম্মদ তাইমুর, মুবা এলাহী ও আয়েশা তাইমুর থেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম। তিনি ছিলেন গা দ্য মোপাসাঁ ও চেখভের অনুসারী; ফলে মোহাম্মদ তাইমুর এর রচনায় তাঁদের ছাপ সুস্পষ্ট। 'নাজারতু শাইয়্যান' (সব কিছু দেখেছি) তাঁর ছোটগল্প সংকলন।

মিশরের ডক্টর তাহা হোসেন (১৮৮৯—১৯৭৩) আধুনিক আরবী সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত। আরবী গদ্যরীতির প্রাচীন ধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে তিনি আরবী সাহিত্যে এক নতুন রীতির প্রচলন ঘটালেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও তিনি স্বকীয়তা ও আধুনিক মনোভঙ্গীসঞ্জাত ধারণা তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে রেখেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সম্পূর্ণ অন্ধ হয়েও তিনি দুই বিষয়ে ডক্টরেট, প্রতিভার বলে আল-আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেক্টর এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। আরবী সাহিত্যের

বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'আল্-আইয়্যাম' (দিনগুলো) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলেও এতে ছোটগল্পের আমেজ আছে।

তাহা হোসেনের অধিকাংশ গল্পই নির্যাতিত মানুষের জীবনবৈচিত্র্য নিয়ে রচিত। তাঁর অন্যতম গল্পগ্রন্থ 'আল-মুয়াজ্জাবুন ফিল্ আরদ' (ঘামে ভেজা মাটি)-এর অধিকাংশ গল্পে মিশরের পাশা ও বেগ ইত্যাদি পদবাচ্য সমাজের উঁচুস্তরের ব্যক্তিদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে সমাজের নিকৃষ্টতম মানুষের দুঃখপূর্ণ কাহিনী। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রন্থটি মিশর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়। মাত্র কয়েক বছর আগে গ্রন্থটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে এবং গ্রন্থটি বাজারে ছাড়া হয়েছে। অন্ধ হয়েও তিনি যে সুক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে সমাজ-জীবনের চিত্রকে আশ্চর্য সুন্দর করে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন এইটেই সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা।

মিশরের বিখ্যাত কথাশিল্পী আবদুল কাদির আল-মাজিনীর গদ্যরীতিও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসঞ্জাত। দেশজ সম্পদকে তিনি ব্যবহার করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেন। তাই আপন দেশের ঐতিহ্য তাঁর রচনায় পরিস্ফুট। তাঁর বাকরীতি, রূপক ও উপমা নির্বাচন, নতুন নতুন শব্দপ্রয়োগ এবং যৌগিক বাক্যের বর্জনরীতি রচনাকে সুখপাঠ্য করেছে, সন্দেহ নেই। মিশরের সমাজচৈতন্য ও জীবনদর্শন তাঁর লেখার মূল উপজীব্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণরূপ তাঁর গল্প সংকলন 'ইবরাহীম আস্সানী' (দ্বিতীয় ইবরাহীম)-তে বর্তমান।

আরবী গদ্যরীতির নবরূপায়ণে মিশরের প্রখ্যাত কথাশিল্পী তাওফীক আল-হাকীমের অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংশনীয়। কেবল শিল্পের জন্য শিল্প নয় (Art for art's sake); জীবনের জন্যও যে শিল্প (Art for life's sake) অপরিহার্য এই সত্যের মূর্ত প্রকাশ তাওফীক আল-হাকীমের রচনায় বিদ্যমান। জীবন সত্যের প্রতিচ্ছবি; সেই সত্যের অপলাপ যারা করতে চায় তারা মিথ্যার বেসাতিই করে, সত্যের শরীরে কলঙ্ক লেপন করিতে সমর্থ হয় না। জীবন তথা সত্যকে

প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর প্রয়াস সত্যি প্রশংসাযোগ্য। তিনি অতীত ও বর্তমানকে এমন স্বর্ণশিল্পে সমৃদ্ধ করেছেন যে, তা ভবিষ্যতেরও গৌরবের বস্তু। তাই তিনি মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্য পীরামিড, মমি, লোক-গাঁথা ইত্যাদি কেন্দ্র করে যে সব উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখেছেন তাতে 'আবুল হোত ইয়াতাকাল্লাম' (পীরামিড কথা বলে) কিন্তু তা বর্তমান কালের জানালায় মুখ রেখে।

আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যে তাওফীক আল-হাকীমই সম্ভবত বেশী পরিচিত নাম। শুধু সংখ্যাধিক্যে নয়, উৎকর্ষ বিচারেও তাঁর রচনা শিল্প-সমর্থিত। ভাষার প্রাঞ্জলতা, আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর রচনায় যা লক্ষ্যযোগ্য তা এই যে, তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে সকলের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

মিশরের আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্ সাহারও অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাদীপ্ত কথাশিল্পী। গদ্যরীতিতে প্রাচীনপন্থী স্বভাব কাটিয়ে উঠলেও তাঁর রচনার বিষয়বস্তুতে প্রাচীনধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণাত্মক কাহিনীর চেয়ে তিনি 'আল-কাসাসুল দি'নী' (ধর্মীয় গল্প) এবং 'কাসাসুল আনবিয়া' (পয়গম্বর কাহিনী) লিখতেই অধিকতর উৎসাহী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সায়্যীদ কাতাব এবং আবদুল হামিদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাজমু আতে আল কাসাসুর রাশেদীন, (খুলাফায়ে রাশেদীনের গল্প সংকলন) এবং 'মাজমু আতে আল কাসাসুল সায়্যেরাতা' (ভ্রমণকাহিনীর সংকলন) ইত্যাদি আরবী সাহিতের অমূল্য সম্পদ। এসব ছাড়াও আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্ সাহারের 'কাসাস মিনাল কিতাবিল মোকাদ্দাসু' (পবিত্র গ্রন্থের কাহিনী) গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের আসহাবে কাহাফ, তওবাতুন নাসূহ সহ আয়াত নাজিলভিত্তিক নির্ভরযোগ্য উপদেশ ধর্মী কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

ইরাকের জাফর আল খলিলী প্রথমতঃ সাংবাদিক পরে ছোটগল্প লেখক। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাফর আল্-খলিলী পর্যায়ক্রমে 'আল রায়য়ী' (কৃষক) এবং 'আল ফজর আল সাদিক' (অনির্বাণ ভোর) পত্রিকা দুইটির সম্পাদনা করেন এবং পরবর্তী সময়ে 'আল হারিফ'

(অবহেলিত) পত্রিকায় যোগদান করেন। নির্যাতিত সমাজের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসই 'আল-হারিফ' পত্রিকায় প্রধানতঃ পত্রস্থ হতো। এভাবে গড়ে ওঠে 'খলিলী সাহিত্যগোষ্ঠী'।

জাফর আল-খলিলীর ছোটগল্প সংকলন 'আল ধায়য়ী' (নিঃসঙ্গতা) এবং 'ইনদামা কুনতো কাদিয়ান' (যখন আমি বিচারক ছিলাম) গ্রন্থ দুটিও খলিলীর বলিষ্ঠ স্বাক্ষর বহন করে। 'ইনদামা কুনতো কদিয়ান' গল্প সংকলনের গল্পগুলো তাঁর বিচারক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভাস্বর।

উপরে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত কথাশিল্পীদের পর পরই আর একদল কথাশিল্পীর আবির্ভাব আরবী সাহিত্যজগতে নব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ১৯৫০-এর পর এঁদের খ্যাতি এবং এঁদের নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক আরবী সাহিত্যকে এক গৌরবময় দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের কালক্রম অনুসারে এঁদেরকে তৃতীয় দলভুক্ত বলে অভিহিত করা যায়। এই দলে যাঁরা নিরলস সাহিত্য কর্ম করছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইউসুফ ইদরীস (মিশর), সুহাইল ইদ্‌রীস (লেবানন), জাবরান ইবরাহীম জাবরান (লেবানন), ইউসুফ শারোনী (কায়রো), সারওয়াত আবাজা (কায়রো), ইউসুফ আল গোরাব (লেবানন), ইবরাহীম আল্‌-আরীজ (লেবানন), আবদুর রহমান বেগ (হলব), ইদ্‌রীস শারাবী (মাজাগান), সুলায়মান আল-ইসা (আম্মান), হোসাইন কাসেম (বৈরুত), জীকরীয়া তামের (দামেস্ক), ওসমান সাদী (ইরাক), অলি তাবেয়ী (লেবানন) প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে জাবরান ইবরাহীম জাবরান প্রতিক্রিয়াশীল কথাশিল্পী। জীবনটা যে গোলাব-কুঁড়ির বিছানা নয় এই সত্যই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। তাঁর মতে তিক্ততা, শঠতা, কদর্যতা ইত্যাদিই সত্যিকার জীবনের সন্ধান দেয়। এবং এসবের লালনই তাঁর শিল্পের উপজীব্য। তাঁর 'আদনান' (আদিম) গল্পের মূল প্রতিপাদ্য শহুরে জীবন অর্থহীন ; কেননা কফি হাউসের গাল গল্পে এর পরিসমাপ্তি এবং চাটুকারিতাই একমাত্র লক্ষ্য। অনুরূপভাবে

'আরাম' গল্পে তিনি এমন 'মই'-এর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে মই দিয়ে কেবল নিম্নদিকেই যাওয়া যায় এবং যার কোন উর্ধ্বগতি নেই। এমন কি 'শুব্বাকুল জুলমাত' গল্পেও এমন 'অন্ধকার জানালার' আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে জানালা-পথে নারী পুরুষ কেবল নিম্নগামী প্রেমে ধাবিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

জাবরান 'ইবরাহীম জাবরান অতিমাত্রায় নৈরাশ্যবাদী এবং তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে নৈরাশ্যবাদিতার স্পর্শ বিদ্যমান। একমাত্র ব্যতিক্রম 'গ্রামোফোন'। অবশ্যি 'গ্রামোফোন' গল্পেও যে জীবন তদ্‌গত তা যেন কৃত্রিম এবং প্রক্‌সির নামান্তর। আধুনিক আরবী কথাশিল্পের সামগ্রিকরূপ পরিদৃষ্টে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এতে স্বাজাত্যবোধ, ঐতিহ্যচেতনা, দেশ-প্রেম ছাড়াও রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন-সম্পর্কিত জীবন যন্ত্রণা। শুধু তাই নয় লেখকদের একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা এবং আন্তরিকতা আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যকে দিন দিন শিল্প-সমৃদ্ধ করে তুলছে। এ প্রসঙ্গে জীকরীয়া তামের-এর 'ইবতাসামা ইয়া ওয়াজহা হাল মুতাব', ওসমান সাদীর 'তাহতা জিসরাল মুআল্লাক', হোসাইন কাসেমের 'দারবেস', আবদুর রহমান বেগের 'আল আনজাতু ওয়াস সারোখী' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা যায়। এঁদের সামগ্রিক রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি কিন্তু এঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইংগীত বহন করে।

পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের মত আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যও যে উন্নত এবং শিল্পসমৃদ্ধ তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। এবং এ জন্যে আধুনিক আরবী কথাশিল্পীদের নিষ্ঠা, একাগ্রতাই কার্যকরী।

আমার কথা

'ভূমিকা' শীর্ষক বক্তব্যে আধুনিক আরবী গল্প সম্পর্কে মোটামুটি একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রায় কুড়িটি রাজ্যের মাতৃভাষা আরবী। কাজেই আরবী সাহিত্যিকদের সংখ্যাও অগণ্য। সবার সম্পর্কে কিছু বলা কিংবা সবার গল্প এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার।

আধুনিক আরবী গল্পের বিষয়বস্তু, টেকনিক এবং রচনাশৈলীর সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যেই মাত্র সাতজন প্রখ্যাত আরবী গল্পকারদের গল্প 'আধুনিক আরবী গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হলো।

গল্পগুলো মূল আরবী থেকে অনূদিত। অনুবাদের বেলায় অনেকক্ষেত্রেই আরবী যৌগিক বাক্যকে বিভক্ত করে সরল বাক্যে পরিণত করা হয়েছে। অবশ্যি মূল ভাব এবং বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত করা হয়নি।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'আরবী কবিতা' গ্রন্থের জন্য অজস্র পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে 'আধুনিক আরবী গল্প' প্রকাশে ব্রতী হলাম। এতে যদি বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা ও সুধীবর্গ সামান্যতমও উপকৃত হন তবে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

সাহিত্যের সমঝদার এবং অনুরাগী 'মুক্তধারা' [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ] গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা ২. ২. ৭৫

আবদুস্ সাত্তার

আধুনিক আরবী গল্প

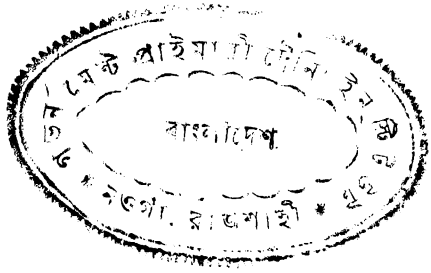

মুস্তাফা হাসান এই বাড়ীর মৃত মালিক পাশার চাকর। আট বছর বয়সের সময় তাকে দূরের কোন বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল। বালক মুস্তাফা বিশ্বাস ও কাজের যাদু দিয়ে প্রভুকে বশ করলো। প্রভু খুশী হয়ে তাকে সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শুনার ভার তার উপর অর্পণ করলেন।

অল্পদিন পরেই মুস্তাফা হাসানের ভাবান্তর দেখা দিল। সে অন্যমনস্ক। দায়িত্ব পালনে অনীহা।

প্রভু ক্ষুণ্ণ হলেন এবং তার পদমর্যাদা কেড়ে নিলেন। মুস্তাফা তখন অবজ্ঞার পাত্র। অবশেষে বুড়ো দ্বাররক্ষক আম্‌ম মারজানের মৃত্যুর পর তাকে সেই পদে বহাল করা হলো।

প্রভুর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে দ্বাররকক্ষই ছিল। প্রভুপত্নী যখন গৃহের একচ্ছত্র কর্ত্রী, তিনি মুস্তাফা হাসা.নর প্রতি অনুগ্রহ দেখালেন। একটা মোটা ভাতা বরাদ্দ করে তিনি মুস্তাফাকে চাকরী থেকে অবসর দান করলেন।

বছর খানেক আগে থেকে মুস্তাফা ফুসফুস যন্ত্রণায় ভুগছে। রোগ এত সাংঘাতিক যে বাঁচবার আর কোন আশা নেই। সে এখন শেষ নিঃশ্বাসের জন্য তৈরী।

ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে দিয়ে খোজা লোকটি উপর তলায় গৃহকর্ত্রীর কক্ষে চলে গেলো। তিনি তখন জায়নামাজে বসে পবিত্র কুরআনের সুরা ইয়া-সীন পাঠ করছিলেন। পাশে একজন বৃদ্ধা মহিলা। তিনি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। খোজা লোকটির পায়ের শব্দে গৃহকর্ত্রী চোখের সোনার চশমাজোড়া কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার কি বললেন বশীর আগা?

বশীর আগা দুই হাতের তালুতে চোখ ঘষে কেবল আমতা আমতা করলো।

মুস্তাফা হাসান কি বেঁচে নেই? গৃহকর্ত্রী উত্তেজিত হলেন।

খোজা লোকটি ততক্ষণে অনেকটা শান্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে। সুতরাং সে চটকরে জবাব দিল, মুস্তাফা এখনো মরে নি। তবে মনে হয় প্রায় শেষ নিঃশ্বাসের কাছাকাছি এসে গেছে।

গৃহকর্ত্রীর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো! তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেয়ুন .....নিশ্চয়ই সব কিছু আল্লার এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি মুস্তাফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মুস্তাফা তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য সুরা ফাতেহা (আল হামদু লিল্লাহ্) পাঠ করা উচিত।

তিনজনে মিলে সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন। বশীর আগা ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলো দশটা বাজে। সে মনে মনে আওড়ালো, মুস্তাফা হাসান ঠিক বারোটায় মারা যাবে।.....দিবালোকের মতই এ কথা সত্য।

ওখান থেকে চলে এসে বশীর আগা রুগী মুস্তাফা হাসানের কক্ষে প্রবেশ করলো। কারণ কক্ষ পাহারা দেবার ভার ছিল তার উপর। সে তো মুস্তাফা হাসানের কাছে নিযুক্ত কর্মচারী। এবং মুস্তাফা হাসানের মৃত্যুর পর সব সম্পত্তির মালিক তো সে নিজেই।.....

মুমূর্ষু মুস্তাফা হাসানের সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে অন্যান্য চাকররা ভেড়ার পালের মতো চলে এলো। তারা দেখলো বশীর আগা তালাবদ্ধ করে লাঠি হাতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে যে ঢুকতে চাচ্ছে তাকেই লাঠি দিয়ে তাড়া করছে।

মুস্তাফা হাসান কি বেঁচে নেই? সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

না, মরে নি। মৃত্যুর কাছাকাছি। বশীর আগার সংক্ষিপ্ত এবং উত্তেজিত জবাব।

সব চাকর বুঝতে পারলো ভেতরে ঢুকবার কোন পথ নেই। তাই আস্তে আস্তে তারা পথ ধরলো। দু' একজন বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো খোজা লোকটির সাথে কথা বলার জন্যে।

আর একদল ছেলেমেয়ে আসলো মুস্তাফা হাসানের মৃত্যু দেখার জন্য। তারা জানালার ধারে রুগীমুখো হয়ে দাঁড়ালো। একজন জনতার ভিড় ঠেলে এসে বললো, কী আশ্চর্য, ওর পেট এতো ফুলেছে কেন? এ যে আকাশ ছুঁতে চাচ্ছে!

দ্বিতীয় বালকের কথাও দৃশ্য-চাপা পড়লো। সে প্রথম বালকের প্রতি এক চক্ষু রাগ দেখালো, কেবল ওর ফোলা পেটটাই দেখলে! ওর চোখে আগুনের ফুলকি দেখেছো? মুখে রক্ত ভেজা থুথু. আগুন···রক্ত···আগুন...রক্ত···।

সবাই চলে গেলো। কিন্তু তাদের সব কথা বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মতো আন্দোলিত হতে থাকলো।

খোজা লোকটি ভালো করে তাকিয়ে দেখে ঘড়িতে এগারটা বাজে। সে মনে মনে বললো, মুস্তাফা হাসান, তোমার কাছে আজরাইল আসতে আর মাত্র একঘণ্টা বাকী। তারপরেই তুমি আর এক নতুন জগতের অধিবাসী। তখন আমি তোমার জমানো ধন সম্পত্তি থেকে আমার পছন্দ মত অনেক কিছু নিয়ে নিতে পারবো।

সর্দার আম্‌ম মাদবুলী একজন ধার্মিক ও প্রবীণ লোক। তাঁর কাছে গিয়ে খোজা লোকটি বললো, আর মাত্র এক ঘণ্টা। তারপরই মুস্তাফা হাসানের জীবনলীলা সাঙ্গ হবে। তার ধন সম্পত্তি কি আমরা নিতে পারি? অথবা, সেগুলো কি চাকর-বাকরদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া ভালো মনে করেন?

বৃদ্ধ সর্দার কেবল মাথা নাড়লেন। সে মাথা নাড়ায় একটা গূঢ় ইংগীত সুস্পষ্ট। আমতা আমতা করে বললেন, যা ভালো মনে করো তাই করবে।

আপনাকে দেবো কয়েক জোড়া দামী জুতো, তিনটে লম্বা কোর্তা আর একটা পশমী কম্বল।

আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, তুমি নিজে কিছু নেবে না?

না, কিছু নয়। টাকার থলেটা পর্যন্ত আমি আমার গৃহকর্ত্রীর হাতে সমর্পণ করবো।

এই কথোপকথন শুনে ঝাড়ুদার তাদের কাছে ঘেঁষলো। খুব নরম গলায় খোজা লোকটির দিকে চেয়ে বললো, হুজুর আমার বিশ্বাস আমার কথা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়?

তোমাকে ভুলিনি ওসমান। তোমাকে কয়েকজোড়া স্যাণ্ডেল দেব। অনেকগুলো মূল্যবান স্যাণ্ডেল আছে।

ওসমান মহাখুশী। চোখ দুটো বড় করে বললো, আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন। আর কাশ্মিরী শালটা আমার ভাগে পড়বে না?

ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ওসমান আনন্দে খোজা লোকটির সাথে মুসাফা করলো।

ভিস্তিওয়ালা আবদুল কাওয়াবী অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সে এসে প্রতিবাদের সুরে বললো, আমি ওর বহু সেবাযত্ন করেছি। আমি কি তার সম্পত্তির কানাকড়িও পাবার যোগ্য নই?

তুমি কি মনে করো আমরা তোমার কথা ভুলে গেছি? বোকা কোথাকার। খোজা লোকটি গর্জন করে উঠলো!

আবদুল কাওয়াবীর আনন্দ আর ধরে না। বক্তব্যের সাথে কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে বললো, আল্লাহ্, আপনাকে আমাদের সঙ্গী করুন।

আমি সামান্যই চাই। প্রথমতঃ ঘনকালো উজ্জ্বল জুতো জোড়া—যেটা পাশা বাহাদুর ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয়তঃ নতুন পাগড়ীটা। গতবছর মাত্র ওটা মুস্তাফা হাসান কিনেছিল। একদিনও ব্যবহার করা হয় নি।

তৃতীয়তঃ ঈদের মৌসুমে কেনা সেই শালটা। যা একেবারে আনকোরা নতুন। একটু ভাঁজও ভাঙ্গেনি।

চতুর্থতঃ.....'

আম্‌ম মাদবুলী ভিস্তিওয়ালাকে বাধা দিয়ে বললেন, তুমি দেখছি কিছুই বাদ রাখবেনা। আরও অনেক চাকর-বাকর আছে। সমস্ত ধন দৌলত আমরা সুন্দরভাবে বিতরণ করতে চাই। মোল্লা শায়েখ আবদুল হাই, বাবুর্চী আলী ও তার ছেলে এবং ঝাড়ুদার সাইয়িদ মুতওয়াল্লী, ওরা কি কিছু পাবে না? আর তুমি.....

ঘরের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদের স্বর ভেসে আসলো। কবরের মাঝখানের অস্বাভাবিক শব্দের মতই ভীতিপ্রদ এবং প্রকট। এই আর্তনাদ মুস্তাফা হাসানের বিকট চীৎকার।

খোজা লোকটি ভয়ে আড়ষ্ট হলো। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে সবাইকে ডেকে বললো, বন্ধুগণ, সময় হয়ে গেছে। মুস্তাফা হাসান এখনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। চলো আমরা ভিতরে যাই।

দরজার তালা খুলে দিলে দমকা হাওয়ার মত সব চাকর ঘরে ঢুকলো। রুগীর বিছানা ঘিরে দাঁড়ালো। মুস্তাফা হাসান মাথাটা সামান্য উঁচু করে বশীর আগার হাতটা জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বললো, ডাক্তার কি বললেন বশীর আগা? শুনলাম, তোমরা আমার জিনিসপত্র নিয়ে কিসব বলাবলি করছো? এসব কি আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে?

বশীর আগা মাথা নীচু করলো। নীরব। রুগীর মুখটা তখন পাণ্ডুবর্ণ। সারা শরীরে অসম্ভব কাঁপুনি। খক্ করে কয়েকবার কেশে হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়লো।

সবাই ভাবলো মুস্তাফা হাসান আর বেঁচে নেই। সমস্ত ঘর জুড়ে একটা নিস্তব্ধতা। সকলেই খোজা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বশীর আগা বুঝতে পারলো কী তাদের অভিপ্রায়। সে সর্দার আম্‌ম মাদবুলীর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কানে কানে কী সব বললো।

আম্‌ম মাদবুলী রুগীর শিয়রে পৌঁছে বালিশের নীচেকার চাবির কৌটা সাবধানে সরাবার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎ রুগী (যাকে মৃত বলে ধারণা করা হয়েছিল) চোখ মেলে চাইলো।

আম্‌ম মাদবুলী চটকরে হাতটা সরিয়ে নিলেন এবং মুস্তাফা হাসানকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি তার এলোমেলো বিছানাটা ঠিক করে দিতে যাচ্ছিলেন।

গোপন অভিসন্ধি ঢাকবার জন্যে তার কানের কাছে আস্তে করে বললেন, মুস্তাফা হাসান, তোমার চাবিগুলো দাও, বাক্স খুলে তোমার জন্য একটা জামা ও একটা চাদর নিয়ে আসি। মনে হচ্ছে, তোমার খুব শীত করছে।

দরকার নেই, জনাব। ওসব আমি ভালো হয়ে ব্যবহার করবো, বলে রুগী পাশ ফিরলো। একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করলো সে। অন্য একজনের একটা হাত বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অবোধ শিশুর মতো আর্তস্বরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো: আমি কি

মরবো ? আমি মরবো না। আমি মরবো না। আমি যেন অনেকটা ভালো বোধ করছি।

মুস্তাফা হাসানের চোখে অশ্রুর বন্যা। কণ্ঠও ভিজে। সে বিছানায় বসতে চেষ্টা করলো: আমি বসতে চাই। আমার মনে হচ্ছে আমার দেহে নতুন শক্তি পাচ্ছি। তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। আমাকে যতটা দুর্বল মনে করো আমি ততটা নই।

মুস্তাফা হাসান কথাগুলো বললো অবশ্যি, কিন্তু নিঃশ্বাস টানতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ সে ধপাস করে বিছানায় পড়ে গেলো। দুটো চোখ ফ্যাকাশে। শ্বাস নেবার জন্যে মুখটা একবার হা করছে আবার বন্ধ করছে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত শরীরে অসম্ভব খিচুনী শুরু হলো। থুথুর সাথে বেরিয়ে এলো একদলা রক্ত। অতঃপর সব শেষ। মুসতাফা হাসান নীরব। নিশ্চল।

আম্‌ম মাদবুলী কাছেই ছিলেন। একটা কাপড় এনে মৃতদেহ ঢেকে দিলেন। এবারে নির্বিঘ্নে বালিশের নীচে হাত দিয়ে চাবির কৌটোটা সরিয়ে নিয়ে বশীর আগার হাতে অর্পণ করলেন।

বশীর আগা তৎক্ষণাৎ অন্যান্য লোকদেরকে চাবির কৌটা বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো।

তারা চাবির কৌটা বাইরে নিতে যাচ্ছে এমন সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেলো।

কৌটা ভেঙ্গে চাবি বের হতেই একদল চেয়ে চেয়ে দেখছিল। অন্যদল ততক্ষণে চাবি কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত। দুই দলে তখন তুমুল ঝগড়া।

বশীর আগা নিজের পাওনা মনে করে টাকার থলে আগেই সরিয়ে রেখেছিল। সে জোরে চীৎকার শুরু করলো, ঝগড়া বন্ধ করো। লোভ তোমাদের পেয়ে বসেছে।

কার কথা কে শোনে? শিকার লয়ে ব্যাঘ্রের মতো দুই দলে টানাটানি শুরু হয়েছে।

বশীর আগা জামার আস্তিন গুটিয়ে সিংহের মতো গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো দলের মাঝখানে। তারপর এটাকে ঘুষি, ওটাকে লাথি মেরে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

বশীর আগা চাবির কাছে হাজির। সে ছালার মতো মোটা দেহটা অতি কষ্টে টেনে এনে চাবির গোছা আড়াল করলো। অন্য দশ জনের নজর এড়িয়ে চাবিগুলো নিয়ে সে সরে পড়লো।

তখনও সেখানে ঝগড়া চলছে।

বশীর আগা ভাবলো এইবার তার গৃহকর্ত্রীর কাছে যাওয়া দরকার। বুদ্ধিমানের মতো তাঁর কাছে পৌঁছে চাকরের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে বললো, এখন মুস্তাফা হাসানের দাফনের জন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন।

ভদ্রমহিলা তাকে অনেক টাকা কড়ি দিলেন।

টাকার থলে নিয়ে সে সোজা চলে গেল তার কামরায়। দরজাটা ভাল করে এঁটে দিল। থলের মুখটা খুলে কোলের মাঝখানে নিংড়ালো। আনন্দের আতিশয্যে গুনে দেখলো টাকার পরিমাণ দু'শ পাউণ্ড। গোনা শেষ করে হাতের দুটো তালু একত্র করে কতক্ষণ ঘষলো এবং বিশেষ যত্ন সহকারে টাকাগুলো নিজের পাশে রেখে দিল। বিড় বিড় করে বললো, মুস্তাফা হাসান, তুমি উত্তম কাজ করেছো।·····কাজের মতো কাজ।...তুমি বড় ভালো মানুষ ছিলে। তাই.....'

ততক্ষণে ঘর থেকে চাকররা সব লুঠ করে নিয়ে গেছে। সেখানে কেবল পড়ে আছে মৃত দেহটি আর ভাংগা আসবাবপত্রের

সেইদিনই বিকেল চারটায় মুস্তাফা হাসানের মৃতদেহ কবরস্থ করা হলো। এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল কয়েকজন শায়েখকে। তাঁরা কেবল মুখে মুখে আওড়াচ্ছিলেন, লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্, আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই।

মৃতদেহটির পেছনে পেছনে বশীর আগার নেতৃত্বে একদল চাকর গিয়েছিল। কবরস্থানে। সে ছাড়া সবাই নতুন জামা কাপড় পরিহিত এবং তাদের পায়ে ঝকমকে জুতো। এসব কাপড় জুতো তারা মৃত মুস্তাফা হাসানের ঘর থেকে লুঠ করে নিয়েছিলো।

ভিস্তিওয়ালা আবদুল কাওয়াবী ছাড়া সবাই নিজ নিজ প্রাপ্যে খুশী। সবাইকে বেশ ভূষায় সজ্জিত দেখে সে আফসোস করে বললো, আমি কি মুস্তাফার জন্য কম খেটেছি? বিনিময়ে আমার কি কিছুই পাওয়া উচিত নয়?

কুশ্রী ওসমানকে দ্যাখো কি সুন্দর কাশ্মিরী শাল পরে আছে। নতুন পাগড়ী ও লাল জুতো জোড়া কি সুন্দর মানিয়েছে তাকে।

আর আম্‌ম মাদবুলী? জীবনে এমন দামী সার্ট কখনো দেখেছে? দামী কম্বল আর ডজন খানেক মোজার কথা না হয় নাই বললাম।

মাদ্রাসার শিক্ষক আল বাইয়ুমী শুধু তার দিকে একবার তাকালেন এবং বললেন, আবদুল কাওয়াবী, তুমি কি পেয়েছো?

এই পুরনো স্যাণ্ডেল জোড়া ছাড়া আর কিছুই পাইনি। মুস্তাফা হাসান মাত্র দশ আনায় এটা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে খরিদ করেছিল। ভিস্তিওয়ালা অভিমানের সুরে কথাগুলো বললো।

বশীর আগা তার দিকে ফিরে থুথু ফেলে পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে অবজ্ঞার সুরে ধমকে উঠলো: চুপ কর হারামজাদা,.....শয়তান.....বোকা—কোথাকার!

জুনমুন আইয়ুব

অভিপ্রায়

।।এক।।

'এমন কী দুর্দান্ত শয়তানও সায়্যীদ ইসমাইলের পুত্র সায়্যীদ ইবরাহীমের কোন ক্ষতি করতে সাহসী হতো না।'

আমি ভয়ে আমার সবচেয়ে ছোট-মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকের মাঝখানে মুখ লুকিয়ে ছিলাম।

তখন শীতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা।

আমরা মাত্র দু'জন। ছোট মা আর আমি।

বাবা গিয়েছিলেন আমার অন্য মায়ের ঘরে, বেশ খানিকটা দূরে। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবো।'

হঠাৎ বাইরে ভীষণ বরফ পড়ার শব্দ। জেলখানার কয়েদীদের মতো চীৎকার করে ঝড় এলো। তখন আমাদের ছোট্ট ঘরটির দরজা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

আমার ছেলেমানুষী ভয় কোন ভাবেই থামতে চাচ্ছেনা। ছোটমা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'আল্লার মহান পীর আবু হাসান তোমাকে সকল ভয় থেকে রক্ষা করবেন। এই মহল্লাটাই তাঁর হেফাজতে আছে। তিনি তোমার বাবাকে অত্যধিক ভালো-বাসেন। তা না হলে এই পবিত্র স্থান সাধারণ একটা মাটির

ঢিবি হিসেবেই রয়ে যেতো, এবং সবারই এটা অজানা থাকতো যে, এখানে কোন মহান পীরের আস্তানা রয়েছে।

তোমার বাবা এখানে সুদীর্ঘ চার বছর ধরে বসবাস করছেন। একবার সেই মহান পীর তোমার বাবাকে স্বপ্নের মাধ্যমে বললেন, 'হে সায়্যীদ ইসমাইল, আল্লাহ্ ইচ্ছা করেই তোমাকে এখানে এনেছেন। তুমি লোকের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, আমার বিশ্রামের স্থানই এখানে। আর সমস্ত লোককে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দাও, সাহায্য করো।.....

'একবার একজন লোক নাকি সেই মহান পীরের মাজারে প্রস্রাব করেছিল। ফলে, সমস্ত গ্রামেই অভিশাপ নেমে আসে—শস্যরাজি বিনষ্ট হয়, এমনকি গাভীর দুধ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

'পরের দিন তোমার বাবা সেই গ্রামে গেলেন। অনেক লোক জমা হলো। তিনি কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীর দুর্দশার কথা, আসন্ন বিপদের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দিলেন।

'আমি স্বচক্ষে দেখেছি বক্তৃতার সময় সমস্ত লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর চারপাশ বেষ্টন করেছিল।

'তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভাইসব, আপনাদের মহল্লায় একজন মহান পীর ঘুমিয়ে আছেন। তিনি একবার স্বপ্নে আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর কবরের উপরে যথেচ্ছা পশু বিচরণ করে এবং তিনি যেখানে অবস্থান করছেন সেই স্থানের প্রতি আসলে কেউ সম্মানই দেখাচ্ছে না।'

গ্রামের সমস্ত লোক একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো, 'সেই স্থান আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাঁর কবর মসৃণ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো, যাতে সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি।'

তোমার বাবা উত্তর দিলেন, 'আজ রাতে নামাজ শেষে মোনাজাত করে শয়ন করবো যেন আল্লাহ্‌তায়ালা সেই স্থান আমাদের দেখিয়ে দেন।'

সেইরাত্রে গ্রামবাসীরা নূতন সূর্যের আলো দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

তোমার বাবা নামাজ আদায় করলেন। মাঝরাতে মাঠের মাঝখানে গিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়ে বলা শুরু করলেন, 'হে আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া কেউ নেই। তুমি মহান।'

পরের দিন ভোরে সমস্ত গ্রামবাসী তোমার বাবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো যে, তিনি সত্যি সেই পীর সাহেবের কবরের নির্দিষ্ট স্থান সনাক্ত করতে পেরেছেন কিনা ?

তোমার বাবা বললেন, 'আপনাদের মধ্যে কেউ যদি রাসুলে করিমের আসল বংশধর থাকেন তবে দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে আমার সাথে আসুন। আমরা একত্রে সেই কবর দেখতে পাবো। কারণ, আমি সেটার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সাবধান, রাসূল-আল্লার বংশজাত না হলে কিন্তু মহা বিপদ। চোখে দেখবেন না ; বুক এবং হাত অসম্ভব কাঁপতে থাকবে।'

এখন বুঝতেই পারছো কে রাসূল-আল্লার আসল বংশধর !

ঘটনাক্রমে প্রমাণিত হলো তোমার বাবা রাসূল-আল্লার আসল বংশধর।

তিনি একটা কোদাল হাতে নিলেন। গ্রামের এক হাজার গজ দূরের মাঠে চলে গেলেন। কোনোও এক নির্দিষ্ট জায়গায় কোদাল চালাতে শুরু করলেন আর বেশ সম্মানের সাথে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ্‌ তুমি ছাড়া কেউ নেই। তুমি মহান।'

কয়েক ফিট গর্ত করেই তিনি কোদাল হাতে থেমে পড়লেন। সূর্যের অম্লান আলো সেখানে প্রতিফলিত হলো। ভেতর থেকে একটা চকমকে পাথরের আভা সূর্যের আলোর সাথে মিশে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। প্রকাশ্য দিবালোকে সেই দৃশ্য দেখে সবাই ঝুঁকে পড়ল সেই দিকে।

তোমার বাবা এক চাপড়া মাটি তুলে মুহূর্তেই ঢেকে ফেললেন সেই অপরূপ দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি। লোককে ভয় দেখালেন, সেটা এক অলৌকিক দৃশ্য। তার আলো চোখে পড়লে সবাই অন্ধ হয়ে যাবে।

সেই স্থান এখন পবিত্র এবং গৌরবময়।

সবলোক একত্র হয়ে সেই পবিত্রস্থান চত্বর করে মসৃণ দামী পাথরে বেঁধে দিলো।

আল্লার অপার মহিমা। একদিন পরেই বৃষ্টি নামলো। মাঠ ঘাট ডোবা জলে একাকার। নদী টইটুম্বুর। মাঠ ভরা শস্য গজালো। হাজার বছরের এক বছর—চরম আশীর্বাদ।

অথচ, গ্রামবাসী বৃষ্টির আশা একরূপ ছেড়েই দিয়েছিল। তোমার বাবা সেই পবিত্র স্থানের তত্ত্বাবধায়ক।

সেই পবিত্র স্থান এখন মহাতীর্থস্থান।

দেশ বিদেশ থেকে অজস্র লোক আসতে লাগলো নানা রকম মানত নিয়ে। একবার এক ভদ্রলোক সেই পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে তাঁর সবচেয়ে এক সুন্দরী কন্যাকে উৎসর্গ করলেন, বিনিময়ে তিনি যেন একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন। কারণ সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী কেবলি কন্যা সন্তান প্রসব করতেন।

আল্লার কি অপার মহিমা! ভদ্রলোক সত্যি সত্যি একটি পুত্র-সন্তান লাভ করলেন। তোমার বাবার কেরামতি আরো বেড়ে

গেল। ভদ্রলোক তার উৎসর্গ করা মেয়ে আর ফিরিয়ে নিলেন না। এবং সেই সুন্দরী কন্যাটিই তোমার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী! কয়েকবছর আগে যখন তোমার জন্ম হয় তখন এই গ্রামের বাসিন্দা ছিল মাত্র কয়েকজন। এখন দেখছো, লোক সংখ্যা কেমন বেড়ে গেছে। অথচ তোমার বাবা এখানে আসার আগে এই গ্রাম ছিল সত্য মরুভূমি—জনমানবের কোন চিহ্নই ছিল না।

আমার ছোট-মা বাবার জীবন কাহিনী অনর্গল বলেই চলেছেন।

রাত ঘনিয়ে এলো। আমাকে শুতে দিলেন বাবার জায়গায়। পাশে ছোট-মা। অত্যধিক শীত। উষ্ণতার জন্যে ছোট মার স্পর্শ চাইলাম এবং ঘনিষ্ঠ হলাম। তিনি আমাকে টান দিয়ে তাঁর বুকের মাঝখানে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপতে লাগলেন। এই আমার জীবনের প্রথম উপলব্ধি যে একজন মহিলা তার সন্তানকে আদর করবার জন্যে কী আবেগেই না দেখাতে পারে!

আমার ছোট-মার কোন সন্তান ছিল না।

আমাদের পরিবারের দুজন মহিলার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধতো। আমি নিতাম ছোট মার পক্ষ। আমার অন্যান্য ভাইয়েরা বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করতো। আমার জীবন তখন বিপদাপন্ন।

আমি শুধু ভাবতাম, ছোট-মা যদি আমার আপন-মা হতেন! আমার বাবা যদি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য না দেখতেন তবে এই মহিলাকেই আমি আমার আপন মায়ের স্থান দিতাম। কারণ, তিনি আমার অন্যান্য মায়ের চেয়ে অতিশয় সুন্দরী ছিলেন আর আমাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন।

আমার ভাইদের গালাগালি, কিল, ঘুষি নীরবে সহ্য করতাম। একবার তারা আমাকে মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এখন

তুমি আর কচি খোকাটি নও। তোমার বয়সের সবাই কাজ করে খাচ্ছে। বসে বসে খেলে তোমার চলবে না, বলে দিচ্ছি।'

এই কথা বাবার কানে গেলো। তিনি ভীষণ রাগ করলেন। আমার ভাইদের ডেকে বললেন, 'সে যা' করে আমার নির্দেশ মতো করে। তার ভরণপোষণের জন্য তোমরা কেউ দায়ী নও। সাবধান, তাকে কেউ কোন কটু কথা বলতে পারবে না।'

বাবার কথা শুনে সেদিন আমার বুকের ছাতি দশ হাত ফুলে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর পাকা দাড়িতে চুমো খাই। তিনি আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন। কারণ আমি তাঁর সবচেয়ে ছোট স্ত্রীকে ভালোবাসতাম যার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

তিনজন কি আনন্দেই না ছিলাম! আমি, বাবা আর তাঁর সবচেয়ে ছোট-স্ত্রী।

।। দুই ।।

আমার বয়স এখন আট বছর।

এর আগে কোনোদিন বিরাট জনসভা দেখি নি। আমাদের গ্রামে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হলো। স্থানীয় সরকারী উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীরা নিমন্ত্রিত হলেন। সবাই আনন্দে মহান অতিথি-দেরকে সম্মান দেখাবার জন্য তৈরী হয়ে গেলাম।

বাবা ছিলেন দলপতি। সবচেয়ে মানানসই পোশাক পরলেন তিনি। মাথায় সবুজ পাগড়ী বাঁধলেন। সাদা দাড়িতে খেজাব মেখে পটে আঁকা ছবির মতো হয়ে গেলেন।

মহান অতিথিরা সবাই বাবাকে সম্মান করলেন। আমি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে মেঝোয় পাতা কার্পেটে বসে আনন্দ করছিলাম।

অতিথিদের মধ্যে একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম আমি। তিনি আমার বাবার মতো পোশাকে সজ্জিত। দুধের মত সাদা পাগড়ীতে মাথা জড়ানো। সাদা দাড়িতে কালো খেজাব চিকমিক করছে। তাঁকে দেখে খুবই অবাক হলাম। বাবার সাথে লোকটার অদ্ভুত মিল। তিনি বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানকার ছেলেমেয়েরা কোথায় আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা করে? তাদের কি নামাজ-রোজা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়?'

বাবা খেজাব নষ্ট হওয়ার ভয়ে দাড়িতে হাত না দিয়ে ঠোঁট হাতাতে হাতাতে বললেন, 'এখানকার ছেলে-মেয়েরা তাদের পিতা-মাতার কাছে শিক্ষা লাভ করে। বাইরে পড়ার দরকার হয় না। আমি তাদেরকে রাসূলের বাণী সম্পর্কে শিক্ষা দিই এবং মহান পীর আবু হাসান আমাকে এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন। এর বাইরে কোন কিছু করা পীর সাহেবের অবমাননা। অতএব বিপদের সম্ভাবনা।.....'

গ্রামের ছোট-বড় সবাই বাবার কথা অসম্ভব মেনে চলতো। তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। গ্রামের অর্ধেক জমি বাবাকে ভোগ করার জন্য দেওয়া হলো। গ্রামের বিরাট দুটো বাড়ীর একটা পীর সাহেবের নামে আর একটি বাবার নামে উৎসর্গ করলেন সবাই।

বাবা ভীষণ ধূর্ত। তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন কালো দাড়িওয়ালা লোকটা প্রথম পদক্ষেপেই তাদের সমস্ত কারসাজি বুঝে ফেলেছেন।

কালো দাড়িওয়ালাও কম চালাক নন। তিনি কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা শুরু করলেন, 'আবু

হাসান যে আল্লাহ্‌র প্রকৃত সাধক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি প্রকৃত সাধক বলেই আপনার মতো গুণী ব্যক্তিকে পছন্দ করেছেন এবং আপনাকে মাজার শরীফের খাদেম নিযুক্ত করা হয়েছে। এখানে আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ সেই মাজার শরীফে গিয়ে মহান পীর আবু হাসানকে সম্মান দেখানো এবং এই অধম আমাকে তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। আপনি ভালো করেই জানেন যে, অপবিত্র ইচ্ছা নিয়ে আবু হাসানের কাছে গেলে তিনি বিরক্ত হন। তাই বুঝতে পেরেছি মহান পীরের ইচ্ছা যে, কেউ আপনার অনুগামী হোক এবং এখানকার ছেলেমেয়েদেরকে পবিত্র কুর-আনের বাণী শিক্ষা দিক। এবং মনে করুন, অধম আমিই সেই মহান পীর আবু হাসানের আশীর্বাদ-পুষ্ট দাস।'

বক্তৃতা শেষ হলো। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বাবার সাথে মুসাফা করলেন এবং ইংগিতময় অসম্ভব ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্‌ তাঁর সাধকের জন্য দাস নিযুক্ত করেছেন এবং তাদের জন্যও যারা সত্য পথের অনুসারী।'

কথাগুলো শুনে বাবার গায়ে ঘাম দেখা দিল। ফ্যাকাশে মুখটা দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। বাবা বললেন, 'অতি উত্তম কথা। তবে পীর সাহেবের নির্দেশের আগে আমি আগামী কাল নফল রোজা রাখবো এবং প্রার্থনা করে স্বপ্নে জানবো কী তাঁর অভিলাষ?'

তাঁরা দু'জনেই মাজার শরীফে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন। বাবা আগে আগে আর তাঁর পেছনে সেই কালো দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। মাজারের কাছে পৌঁছে তাঁরা উপরে ঝুলানো পাগড়ীতে চুমো খেলেন। তারপর সূরা ফাতেহা পড়ে ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন।

বাবা তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর বাবার মুখ থেকে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হলো, 'মোল্লা মোহাম্মদ!'

প্রায় গোটা দিনটাই বাবা গোপন জায়গায় নিরিবিলি কাটালেন। পরের দিন সকালে সবার সম্মুখে ঘোষণা করলেন, 'মহান পীরের ইচ্ছা মোল্লা মোহাম্মদ এখানকার মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হোন। ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শিক্ষা করুক।'

এই সংবাদে সবাই খুশী হলেন। পরের দিন গ্রামবাসী দলে দলে মোল্লা সাহেবকে দেখতে এলেন। সব ছেলেমেয়ে মিলে তাঁর সাথে মুসাফা করলাম এবং অবশেষে তাঁকে ঘিরে বসলাম।

আমাদের সবাইকে তিনি একটি করে বই দিলেন। সেই বইয়ের উপরে ছিল বড় বড় কালো দাগ। সবার আগে আমি বইয়ের পাতা খুললাম। চেয়ে দেখি বইয়ের ভিতরে অজস্র পোকার হামাগুড়ির মতো আঁকিবুকি। কতকগুলো বৃত্তের মতো গোলাকার আবার কতকগুলো সোজা, খাড়া।

মোল্লা সাহেব বললেন, 'আমি যা যা বলি তোমরা তাই বলো।'

তিনি বইয়ের প্রথম পাতা খুলে একটি অক্ষর নির্দেশ করে এবার বললেন, 'বলো, আলিফ।'

আমরা সবাই এক সঙ্গে বললাম, 'আলিফ।'

কয়েক ঘণ্টা তাঁর কাছে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। অল্প সময়েই প্রমাণিত হলো যে, আমি সবচেয়ে ভালো ছাত্র।

মোল্লা সাহেব খুশী হলেন।

আমি মোল্লা সাহেবকে নিয়ে একরূপ দৌড়ে বাবার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'যা পড়েছো একবার বলতো।'

আমি এক নিঃশ্বাসে সব অক্ষরগুলির নাম বলে দিলাম।

আনন্দ ও খুশীতে বাবার চোখে পানি এলো। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। তুমি যেন আবু হাসানের অলৌকিক গুণের অধিকারী হও। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তুমি এক মহান ব্যক্তি হবে, আল্লাহ্‌র সত্য কথা প্রচার করবে আর হবে মহান পীর আবু হাসানের নিশান বড়দার।'

বিদ্যুতের মতো এই খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো।

আমার মা খুশীতে ডগমগ। সেদিন থেকে আমার ভাইয়েরা আমাকে ঠাট্টা বা ধমক দিতে সাহস পেতো না। দ্বিতীয় বারের মতো আমি সবকিছু করতে পূর্ণ স্বাধীনতা পেলাম।

একদিন বিকেলে খেলা করছিলাম। এমন সময় গ্রামের একটি ছেলে আমার কাছে এসে বললো, 'কেবল তুমি একা পড়া পারো না, হাসিমও পারে। সে সব অক্ষর চিনে ফেলেছে।'

সত্যি হাসিম সব অক্ষর চিনে ফেলেছিল। সে আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব অক্ষর নির্ভুল বলতে পারতো।

কেঁদে কেঁদে বাবার কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম। বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, 'আবু হাসানকে রাগাবার জন্যে শয়তান তাকে এইসব শিখিয়ে দিয়েছে। মোল্লা সাহেব নিশ্চই জানেন, শয়তানের কাজ হাসিমের প্রতি কতটা কার্যকরী।'

পরের দিন দেখলাম মোল্লা সাহেবের হাতে একটা কাঁচা কঞ্চি। তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের বললেন, 'তোমাদের কারও কারও অন্তরে শয়তান আসন গেড়ে বসেছে। সেই শয়তান তোমাদেরকে আবু হাসানের শত্রুতে পরিণত করতে সাহায্য করছে। যাকে আমি এই কাঁচা কঞ্চি দিয়ে প্রহার করবো, চীৎকার করে বলে উঠবে, 'হে আল্লাহ্ শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।'

হাসিম আমার চেয়ে সত্যি লেখা পড়ায় ভালো ছিল। মোল্লা সাহেব হাসিমকেই প্রথম ভীষণ প্রহার করলেন।

হাসিম চীৎকার করে বলে উঠলো, 'হে আল্লাহ্, আমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।'

তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা গড়াতে লাগলো।

মোল্লা সাহেব সবাইকে ডেকে বললেন, 'তোমরা মনে রেখো, যদি কেউ সায়্যীদ ইসমাইলের পুত্রের চেয়ে পড়ায় বেশী পারো তবে মনে করবে যে, শয়তান তোমাদেরকে আবু হাসানকে অসন্তুষ্ট করার জন্য এইসব শিখিয়ে দিচ্ছে।'

সেদিন থেকে আর কেউ লেখা পড়ায় আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতো না। সত্যি যদি কেউ আমার চেয়ে ভালো পড়া পারতো তবে হঠাৎ করে তার শয়তানের কথা এবং কড়া প্রহারের কথা মনে পড়ে যেতো। কাজেই ভুল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

।। তিন ।।

প্রথম বছরেই পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত মুখস্থ করে ফেললাম। তিন বছর পর মোল্লা সাহেব ঘোষণা করলেন যে, আমি ভালো করে পবিত্র কুরআন আয়ত্ত করতে পেরেছি। কাজেই তিনি তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কার দাবী করলেন।

বিরাট ভোজের আয়োজন করা হলো।

আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন গ্রামের সব ছেলেপেলে সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। মোল্লা সাহেব তাদেরকে লাইনে দাঁড় করালেন। নিজে গেলেন সবার সামনে। দলের নেতার হাতে সবুজ পতাকা, ব্যাণ্ড পার্টির মিষ্টি

আবার গ্রামে ফিরে এলাম।

দেখি, মাজারের চতুর্দিক অদ্ভুত সুন্দরভাবে সাজানো। এখানে ফিরে এসে নিজে বিড়ালের মতো হলেও সিংহ ভেবে নিলাম আমাকে। পূর্ব-অনুভূতি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তার আগে মনে হতো সমস্ত জ্ঞান যেন শুকিয়ে গিয়েছিল।

মাজারে পৌঁছে উপরের ঝুলানো পাগড়ীতে চুমো খেলাম। সূরা ফাতেহা পাঠ করলাম। আমাকে ফিরে পেয়ে মোল্লা সাহেব, বাবা এবং গ্রামের সবাই মহা খুশী। মনের গোপন ভাব একটুও প্রকাশ না করে বোঝাবার ভাণ করলাম যে, বড় শহরের স্কুলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত ধর্মীয় শিক্ষা গ্রামের শিক্ষার কাছে একেবারে ম্লান; মোল্লা সাহেব ও বাবার কাছে অন্ধের মতো শেখা সেই শিক্ষাই যেন আমার কাছে বড়ো প্রিয়।

মাজার সম্পর্কে এতোদিন যে সন্দেহ মনে মনে পোষণ করতাম তা আরও বেড়ে গেলো। মাজারের চার পার্শ্বে ভালো করে ঘুরলাম। ঝলমলে আলো এবং রেশমী কাপড়ের চাঁদোয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

বাবা পাগড়ীটার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে আমাকে বুঝালেন, 'এই পাগড়ীই পীর সাহেবের আসল মো'জেজা। এবং এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে জয়ের চিহ্ন।'

পাগড়ীর সেই জৌলুস অনেকটা স্তিমিত। বিশ বছরে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। আমার নতুন-জ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করলে কেবলি আশ্চর্য লাগে, কি করে সেই আশ্চর্য পাগড়ী দীর্ঘ দিন পরেও বিনষ্ট হয় নি। সেই সঙ্গে এটাও আশ্চর্য লাগে যে, সেই পাগড়ীর উজ্জ্বল আভা এবং অলৌকিক জ্যোতি কেবল আমার বাবার চোখেই প্রতিভাত হতো! যদি সেসব মাটির নীচেই ছিল

তবে পীর সাহেব কেন একমাত্র বাবাকেই সেগুলো আবিষ্কার করার পন্থা বাতিয়ে দিলেন? আমার বাবা ছাড়া পীর সাহেবের অলৌকিক চিহ্ন সমূহ আর কেউ তো কোনোদিন দেখেনি! কারণ তিনিই তো সমস্ত লোককে ভয় দেখাতেন, 'তোমরা অন্ধ হবে। তোমাদের বুক কাঁপবে। পীর সাহেব তোমাদের ঘাড় ভাঙবেন ইত্যাদি।'

সন্দেহের ঢেউ আমাকে তোলপাড় করতে লাগলো আর শয়তান তাড়াবার জন্যে আমি বদ্ধপরিকর হলাম। কাজেই মাজারের পাশে ঘুমাবার মনস্থ করলাম, যাতে সেই পীর সাহেবের আসল মোজেজা লক্ষ্য করতে পারি।

এক শুক্রবারের রাত্রি নির্দিষ্ট করলাম। মনের গোপন কথা মনেই চেপে রেখে মাগরেবের নামাজ বাদে জামাত থেকে আস্তে করে কেটে পড়লাম।

রাস্তা জনমানব হীন। রাত্রির অন্ধকার আলকাতরার মতো কালো। তখন সেই মাজারটিকে মনে হলো এক ভীতিপ্রদ পাহারাদার। সেই পাহারাদারের সম্মুখে গ্রামের নির্জনতার শান্তি ভঙ্গ করে কেউ এদিকে পা বাড়াতে সাহস না পায় এমন পরিবেশ।

॥ চার ॥

মাজারের সদর দরজার কাছাকাছি যেতেই একটা ফিস ফিস শব্দ কানে এলো। তবে কি পীর সাহেব আমার প্রতীক্ষা করছিলেন? ভয়ে আমার গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেলো। ভাবলাম পালাই কিন্তু মনোবল আমাকে সেই শব্দের কাছাকাছি যেতে সহায়তা করলো।

ফিস ফিস শব্দ আসছিল একটি কামরার উন্মুক্ত জানালা পথ দিয়ে। সেই কামরায় আমার ভাই মাজার পাহারা দেবার কালে শয়ন করতো।

জানালার কাছাকাছি গেলাম। দেখি, শব্দ আমার ভাইয়ের। একেবারেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তাকে বলতে শুনলাম, 'সাদা, তুমি আমার কাছে না আসলে আমার ঘুম হয় না। তোমার নরম বুকের স্পর্শ পাবার জন্যে আমার হৃদয় কেবলি হাইফাই করে।'

সাদা আমার ভাইকে জড়িয়ে ধরে জবাব দিলো, 'পীর সাহেবের শপথ, হে আবদু সামী, যদি কেউ না দেখে তবে আমি প্রত্যেক কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আসতে পারি।'

'পীর সাহেব আমাদের রক্ষা করবেন। কাজেই তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।' আমার ভাইয়ের নরম কণ্ঠ।

ঃ 'না, আমার ভীষণ ভয় হয়। কারণ, আমার স্বামী খুব কড়া মানুষ। আমাকে তিনি অত্যধিক ভালোবাসেন। পীর সাহেবের প্রতি তাঁর একটুও বিশ্বাস নেই। যদি তিনি আমাকে এখানে এই অবস্থায় দেখে ফেলেন, তবে নির্ঘাৎ খুন করবেন।'— সাদার দীর্ঘ নিশ্বাস।

কথাবার্তার মাধ্যমে দু'জন দু'জনকে চুম্বন করলো। কি হাসি! শব্দ হয় না। অথচ গালের নরম মাংসের ভাঁজ দেখলে বোঝা যায়।

প্রথমে আমার কান তারপর দুই চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভাবলাম তাদেরকে বিরক্ত করে কিংবা ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। হয়তো এর চেয়েও বড় কিছু হারাতে হবে।

আমি মাজারের কাছাকাছি গিয়ে মোনাজাত করলাম যেন পীর সাহেব আমার চোখের পর্দা খুলে দেন।

আস্তে করে দরজা খুলে মাজার-ঘরে প্রবেশ করলাম। ঠিক চোরের মতো। মাঝখানে উঁচু কবরের একটা ছায়া দেয়ালের দিকে শুয়ে আছে। হঠাৎ সেই ছায়াটা নেচে উঠলো। ঘরের বাতি সরালে ঘরের কোন কিছুর ছায়া যেমন নড়ে উঠে ঠিক তেমনি।

আমি তো ভয়ে কণ্ঠাগত। পরক্ষণেই চুপ।

কয়েক মিনিট পরেই নাকের গড়গড়ানির শব্দ কানে এলো। চারদিকে ভালো করে তাকালাম কোথা থেকে শব্দ আসছে জানবার জন্যে। পরে জানলাম সেটা আমার বাবার নাক-ডাকানোর শব্দ। মাদুরে শুয়ে অমন গোঙাচ্ছিলেন।

বাবাকে জাগানোর কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। কাজেই সামান্য দূরে ঠিক বাবাকে আড়াল করে একটা জায়নামাজ ছড়িয়ে আমার মুখস্থ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ম'ন মনে আওড়ালাম।

এক ঘণ্টা কেটে গেলো। আমার চোখের পাতা ক্রমশঃ ভারি হয়ে আসছিল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। উপরে ঝুলানো পাগড়ীতে চুমো খেলাম, এই জন্যে যে, পীরের দোয়ায় যেন আরও অনেক কিছু জানাতে পারি।

স্যাঁতসেতে বালির উপরে মাদুর বিছিয়ে আরাম করার জন্যে পা ছড়ালাম। মাথাটা বাহুর উপর রেখে ভাবতে লাগলাম আমার ভাই আবদু সামীর কথা। কি আনন্দেই না তার সময় কাটছে সাদার বাহু পাশে। অথচ পীর সাহেবের অভিশাপে তার চোখও অন্ধ হচ্ছে না, বুকও কাঁপছে না। অথবা পীর সাহেব তার ঘাড়ও ভেঙ্গে দিচ্ছেন না।

এখন যদি সেই পীর সাহেব কবর থেকে উঠে আসেন আর তাঁর অলৌকিক আলো জ্বেলে দেন! তাহলে এই পাপীদের কী অবস্থা হবে?

নানা ধরনের চিন্তায় মশগুল। হঠাৎ আবার একটা শব্দে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি আবছা আবছা আলোকে দেয়ালে একটা মানুষের ছায়া। মনে হলো কে যেন উঠে আসছে। ভয়ে আমার কণ্ঠ তালু এক সঙ্গে শুকিয়ে গেল। ভাবলাম আমার কল্পনা বুঝি বাস্তবে রূপায়িত হতে যাচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে ছায়াটা পরীক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। দেখি ছায়াটার দেহ উবু হলো এবং হাত দিয়ে একটা গর্তের ঢাকনা খুলে এক অপরূপ শব্দের সৃষ্টি করলো। শব্দটা পরীক্ষা করে বুঝলাম একটা জীবন্ত মানুষ—গর্তে প্রস্রাব করে ঢাকনা পুনরায় যথাস্থানে রেখে শুয়ে পড়লো। আবার সমস্ত নীরব।

নিশ্চুপ বসে রইলাম। জ্ঞানের সমস্ত দরজা খুলে ভাবতে লাগলাম আমার বাবা কি করে এমন একটা পবিত্র স্থানে প্রস্রাব করতে সাহস পেলেন? অথচ কোনো অন্যায় কাজ করলে নাকি আবু হানান চোখ অন্ধ করে দেন। ঘাড়ও ভাঙ্গেন।

আমার সমস্ত সন্দেহ একটা নিশ্চয়তার ঠিকানায় এসে পৌঁছলো। আমি ভীষণ আনন্দিত যে, আমার নামাজ আজ এখানে ব্যর্থ হয় নি। সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি আমাকে এক মহাতৃপ্তির পথে নিয়ে গেলো।

বাবা যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন, আমি চোরের মতো পালিয়ে এলাম। রাস্তায় অজস্র তারার আলোকে একটা নারীমূর্তি আমার সাড়া পেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বাড়ী পৌঁছলাম। মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

: 'পীর সাহেবের মাজারে।'

মার কাছে আর একটু এগিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, মা, আব্বাসের স্ত্রী সাদা এত রাত্রে পীরের আস্তানায় যায় কেন ?'

: 'সাত বছর হলো সাদার বিয়ে হয়েছে। অথচ কোন সন্তান হয় নি। সন্তানের আশায় সে ওখানে যায়।' মা বললেন।

: 'এবার আল্লাহ্‌র রহমতে তার ঘরে খুব সুশ্রী একটা সন্তান আসবে' বলে, মনে মনে হাসলাম।

পরের দিন সকালে মাজারে গেলাম। আমার মুখে বিজ্ঞের হাসি। বাবার সাথে মুসাফা করলাম। পাগড়ীতে চুমো খেলাম। বাবার ভয়ঙ্কর মূর্তি লক্ষ্য করে তাঁকে যথোচিত সম্মান করলাম। এরূপ সম্মান আগে কোনদিনই করি নি।

বুঝতে বাকী রইলো না যে আমার বাবা একাকীই সেই পীর এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী। যার ফলে সমস্ত লোককে তিনি এমন ভাবে অন্ধ করে রেখেছেন। বুঝতে পারলাম এটাই তার একমাত্র উপার্জনের পথ। স্থানীয় সুলতানের চেয়ে এই মহল্লায় তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাশালী !

যখন অগণিত ভক্ত ও তীর্থযাত্রী আসতে থাকতো আমি সেখানে নীরবে বসে পবিত্র কুরআন পাঠ করতাম। জায়গাটা শূন্য না হওয়া পর্যন্ত আমি ওখানেই বসে থাকতাম। সবচেয়ে বেশী নজর থাকতো সেই অলৌলিক আলোর প্রতি যেটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। নিশ্চুপে উঠে গিয়ে ঝুলানো পাগড়ীর নীচের অক্ষরগুলো উদ্ধার করে দেখলাম তাতে স্পষ্ট লেখা 'মাজেন দারেনের তৈরী।'

বুঝতে বাকী রইলো না যে, পাগড়ীটা কোথা থেকে এসেছে।

অট্টহাসি হেসে মাজারের কাছে গিয়ে বললাম, 'হে শক্তিশালী পীর সাহেব, আমি যা জানি যদি গ্রামবাসী তার সামান্যতমও জানতো তবে তারা সবাই মিলে চিরদিনের জন্য আমার বাবাকে এখান থেকে বের করে দিতো। তাদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতো। তখন আমাদের পরিবারের লোকদের ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই থাকতো না! কোথায় থাকতো আমাদের এই দৌরাত্ম্য!

আমার শৈশবের পরিসমাপ্তি এখানেই।

নাজীব মাহ্‌ফুজ

পাগল

পাগল।

হ্যাঁ, পাগল এমন একজন মানুষ, যে জীবন ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে দূরে ঠেলে দিতে পারে। তার বাইরে তাকান, দেখবেন আপনার মনকে প্রশ্নের বাণে বিক্ষত করছে। আর ভেতর? সেতো তালাবদ্ধ রহস্যের সিন্দুক!

যার কথা বলছিলাম। সে এখন হোটেলের বাসিন্দা। বুদ্ধিমানের মতো অতীতের স্মৃতি-চারণ এখনো তার পক্ষে সম্ভব। বর্তমান অনেকটা আয়নার মতো স্পষ্ট হলেও ক্ষ্যাপামিতে মনে হয় অতীতকে সে মোটেই আয়ত্ত করতে পারে না। মানসিক স্থিরতা নেই বলেই সে এমন ছন্নছাড়া, বিব্রত।

তাকান না উপরে তোলা মেঘ-ঢাকা আকাশের পানে! কেমন রহস্যের বেড়াজালে ঘেরা সে আকাশ! মেঘের অন্তরালের আলোক ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতির কণার মতো চমকায়। আবার অন্ধকার-মেঘ এসে সে আলো কেমন আড়াল করে দেয়। মেঘের এই এলো-মেলো খেলা আপনাকে শুধু ভরিয়ে তুলবে। আপনি 'থ' বনে যাবেন।

কিন্তু? খোঁজ করুন কোনোও বিশ্বস্ত জ্যোতির্বিদ! তিনি ঠিক ঠিক আপনাকে সৌর জগতের খবর বলে দেবেন। বুঝলেন তো

এখন আসল ব্যাপারটা কি? এখন যেটা ভালো কাল হয়তো সেটা মন্দে পরিণত হবে। নইলে কি লোকটি এমন করে ভীতিপ্রদ জানোয়ারের মতো অবজ্ঞেয় হয়?

আসলে লোকটা ছিল ভীষণ নিঃসঙ্গ। এবং এ জন্যে সে নিজেই দায়ী। বন্ধু সংসর্গ, আমোদ-স্ফূর্তি ইত্যাদিকে ছেঁড়া কাঁথার মতো সে বর্জন করে চলতো। শিশুকাল থেকে তার এই অভ্যাস সত্যিকার জীবন-গঠনের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং এই শিক্ষাই তার ব্যর্থতার কারণ।

হ্যাঁ, তার জীবনে বড় রকমের একটা হবি ছিল। কফি হাউসের নির্জন কক্ষে বসে জানালা পথে জনতার মুখ দেখে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারতো। এ ব্যাপারে ছিল সে নির্বিকার। বাঁকা কনুই গাল থেকে নামিয়ে সোজাই করতো না। অথচ কোনো ক্লান্তির রেশ তার মুখাবয়বে ছায়া ফেলে নি।

কফি হাউসের নির্জন কক্ষের চেয়ারে বাঁধা ছিল তার জীবনের সূতো। এখানেই সব কিছু সীমাবদ্ধ। এর বাইরের জীবনের কোনো স্পন্দন তার দেহে ও মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। এবং এই পরিবেশ শেষ পর্যন্ত তাকে একটি স্থবির মূর্তিতে পরিণত করলো—রক্ত-মাংসের মূর্তি। সে মূর্তি কেবল চেয়ে চেয়ে জনতার মুখ দেখতে পারে! কিন্তু সেখানে জীবনবোধ নেই।

সেই স্থবির মূর্তিতেও একদিন হঠাৎ চিন্তার ঢেউ আলোড়ন সৃষ্টি করলো। যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে।

কিসের এই ঢেউ?

কফি হাউসের চেয়ারে বসে সে লক্ষ্য করলো একদল লোক রাস্তায় বালু ছড়াচ্ছে। এই বালু ছড়ানোর কারণ তাকে ভাবিয়ে তুললো। এবং এটা রীতিমত তাকে পাগল করার ব্যবস্থা! সে

নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করে, "কি জন্যে ওরা অমন করে বালু ছড়ায় ?'

আবার নিজের মনেই এর সমাধান খোঁজে, 'বালু বাতাসে উড়বে, মানুষের নাকে-মুখে ঢুকবে। আহ্ কি কষ্ট ?'

শুধু প্রশ্ন করে কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হয় না। তথাপি রহস্যময় পৃথিবীর বহু সমস্যাই প্রশ্ন নিয়ে মনের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এই ধরুন, ওর কি জন্যে বালু ছড়ায়, আবার বালু বাতাসে উড়ে' ইত্যাদি।

সে এক মহারহস্য। কিন্তু কেন এই রহস্য ?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সে।

অট্টহাসিরও প্রয়োজন আছে। এটা তার পক্ষে মহা উপকারী। নিঃসঙ্গতার মধ্যে একমাত্র সাথী এই অট্টহাসি। একা একাই বলে চলে, 'কেন ওরা বালু ছড়ায় ? কেন বালু বাতাসে উড়ে ?...'

পরের দিন।

ভোরে স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে এলোমেলো ভাবনায় নিজেকে বিব্রত করে তুললো। হঠাৎ টাই-এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই নতুন এক প্রশ্নে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। আবার মনে মনে প্রশ্ন, 'কি প্রয়োজন ? গলায় কেন এই ফাঁসের ব্যবস্থা ? অথচ এই টাই-এর রং চয়েচ করতে কেন এতো গলদঘর্ম হই ?'

আবার অট্টহাসি, হা...হা... হা...

টাই থেকে দৃষ্টি শরীরের সমস্ত কাপড়ে নিবদ্ধ। একটা ঘৃণা, একটা ক্ষোভ তাকে পেয়ে বসলো। আবার প্রশ্নের কীট তাকে কামড়াতে থাকে : 'এভাবে এই কাফনপরিবৃত হওয়ার প্রয়োজনটা কি ? মৃত্যুর আগেই ! আল্লাহ্ যেভাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে অবস্থায় ফিরে গেলে ক্ষতি কি ?'

বললেই কি হয়?

রোজকার নিয়মে যথারীতি কাপড় পরে সে বেরিয়ে পড়লো।

দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গতা সে আর ফিরে পাচ্ছে না। সেই নিঃসঙ্গতায় এখন চিন্তাভাবনাই একমাত্র সাথী। তার শরীরের মোটা পোশাক-পরিচ্ছদ! গায়ে ছালার মত ভারী লাগে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তা সরিয়ে ফেলা যায় না। আর এসব পরিহার করবেই বা কি করে? নানারূপ প্রশ্নের জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে সে রাগে ক্ষোভে দগ্ধ হতে থাকে।

আবার প্রশ্ন: 'মানুষ কি পরাধীন?'

না।

আমি স্বাধীন। নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দেয় বিড় বিড় করে।

স্বাধীনতার একটা সুখানুভূতিতে সে মত্ত হলে তার চার পাশে মুক্ত আলো, বাতাস একটা আনন্দ তাকে ঘিরে নাচতে থাকলো

হ্যাঁ, সে স্বাধীন

সেই স্বাধীনতা ওহির মতো তার উপর নাজেল হয়েছে। এখন সে নিজের খুশি মতো যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে কোনো শক্তির তোয়াক্কা সে করবে না। সে এখন কারো অনুগত দাস নয়।

ম্যাজিকের মত বড়ো রকমের একটা সমস্যার নিরসন হলো। অন্ততঃ প্রলাপ বকার হাত থেকে রেহাই পেলো সে।...

এ যেন এক নতুন অনুভূতি। একটা আত্মতৃপ্তির লক্ষণ তাই এখন সে হোটেলের জানালাপথে বসে জনতার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। ভাবতে পারে, তারা খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না।

কিন্তু সে? সম্পূর্ণ স্বাধীন। সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছামতো বসতে পারে, কিংবা পারে দাঁড়াতে। এবার তার দৃঢ় সংকল্প: 'মঙ্গলের জন্য আমি নিশ্চয়ই অগ্রসর হবো?'

কতক্ষণ নীরব। তারপর চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিজের মনেই প্রশ্ন করে, 'মাথার উপরে দু'হাত তুলতে কি পারবো আমি? নিশ্চয়ই পারবো।'

আশ্চর্য! আর পায় কে? মাথার উপর দু'হাত খাড়া করে নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করলো, 'আমি সাহসী বীর। আসুক, কার এত ক্ষমতা যে আমার স্বাধীনতা হরণ করে? আমি স্বাধীন।'

বাম পা তুলে ড্যাং ড্যাং করতে করতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

সে একা। কী এক আনন্দ তার চোখে মুখে বিদ্যুৎ ছড়ালো! অতীতের কোনো স্মৃতিই তাকে পীড়িত করছে না এতোদিন কেন তার জীবনে স্বাধীনতার সুখ আসেনি?

এবারে সে রাস্তায় নামলো। মনে স্বাধীন জীবনের আনন্দ!

কফি-হাউস পছনে রেখে হোটেলে গেলো লাস খেতে দেখে, শো-কেসে নানা ধরনের খাদ্য সাজানো। পাশের টেবিলে একজোড়া দম্পতি মুখোমুখি বসে মুরগীর রোষ্ট খাচ্ছে দু জনের কি হাসি! অদূরের রাস্তায় কয়েকজন ছেলে-পেলে ময়লা-নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরে ওদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। পাশাপাশি দু'টি বেমিল দৃশ্য সে মোটেই সহ্য করতে পারলো না সে তো স্বাধীন! স্বাধীনতা তাকে পীড়া দিলো। হোটেলে না ঢোকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সে একমনে ভাবছে, ছেলে-পেলেদের নিয়ে নব-দম্পতির এক সঙ্গে খাওয়া উচিত! কিন্তু এত নোংরা ছেলেদের সাথে নিয়ে খেতে নব-দম্পতি কি রাজী হবে? তবে হ্যাঁ, মুরগীর রোষ্ট যদি দূরের মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় তবে নিশ্চয়ই তাদের হাত থেকে ওটা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না

সে ভাবলো, ফেলে আমি দেবোই দেখি, কে আমাকে বাধা দেয়?'

সে আস্তে করে টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। হাতটা বাড়িয়ে মুরগীর রোষ্ট এক ঢিলে ছুঁড়ে মারলো নোংরা ছেলেদের মাঝখানে। তারপর নির্বিকার ভাবে সে বেরিয়ে গেল, যেনো কোনো অন্যায়ই সে করে নি।

হোটেলের ম্যানেজার কতক্ষণ চেঁচিয়ে পিছু নিলো। সে তখন অট্টহাসি হেসে ছুটে চলেছে। সে বিজয়ী।

কফি-হাউসে ফিরে এলো। এখন কিন্তু সেখানে চেয়ারে বসে দু'ই হাত ভাঁজ করে গালে ঠেস দিয়ে ভাবনার রাজ্যে স্থির থাকতে পারে না। সে এখন চঞ্চল। নীরবতায় স্থির থাকা আর সম্ভব নয়।

ওঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো একটা লোকের উপর। মোটা নাদুস-নুদুস চেহারা লোকটির প্রায়ই হোটেলের প্যাসেঞ্জার হয়। তার ব্যবহারে ঔদ্ধত্যের লক্ষণ। চলাফেরায় এমন একটা ভাব স্পষ্ট যেন ধরাকে সে সরাজ্ঞান করে, টুকরো কাগজের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালো। তারপর অট্টহাসি···। মনে মনে ভাবলো, 'দিই শালাকে এক থাপ্পর মেরে বিদায় করে। নইলে আমার এ স্বাধীনতা বিফলে যাবে।'

শরীরে একটা অসম্ভব ঝাঁকুনী তুলে সে এগিয়ে গেল এবং ঠিক মুখের উপর দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে হাতটা উপরে তুলে কষে এক চড় বসিয়ে দিল লোকটার গালে। চড়ের শব্দ গিয়ে কফি-হাউসে প্রতিধ্বনি তুললো। এবারে আরও হাসি—দেয়ালফাটানো হাসি।···

এই ঘটনাটি হোটেলের ঘটনার চেয়ে একটু ব্যতিক্রম। লোকটি রুখে দাঁড়ালো এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আমাদের বন্ধুর কাপড়

টেনে ধরে কিল-ঘুষি মারতে শুরু করলো। এই নাটকের অভিনয় চললো কিছুক্ষণ। একদল লোক এসে সরিয়ে দিলো দু'জনকে দু'দিকে।...

কফি-হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লো। আশ্চর্য! এত মারের পরও সে নির্বিকার। মুখে কোনো ক্রোধ বা অনুশোচনার চিহ্ন নেই—বরং একটা আনন্দের রেশ তার সারা মুখমণ্ডলে

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। এর পশ্চাতে তার সদ্য পাওয়া স্বাধীনতার প্রেরণা।

এই স্বাধীনতার অনুভূতি এক মুহূর্তেও তার কাছছাড়া হয় নি স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই সে নিজেকে মনে করেছে সাহসী, বিজয়ী। ফলে, কতজনকে যে চড় মেরেছে, থুতু দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিনিময়ে তাকেও পেতে হয়েছে কিল, ঘুষি, লাথি। এমন কি তার জামা-কাপড় এবং টুপির ঝুলও ছিড়ে দিয়েছে। সামনের দু'পাটি দাঁতও অক্ষত রাখে নি

কিন্তু, এতে কি তার কিছু হয়েছে! সে নির্বিকার। মুখে অট্টহাসি লেগেই আছে। মৃত্যুকে অবজ্ঞা করেও সে হাসতে পারে।

সেদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় দৃষ্টি পড়লো এক রূপসী মহিলার উপর। মহিলাটি এক সুদর্শন যুবকের হাত ধরে রাস্তা চলছিল। তার পরনে অতি পাতলা জ্যাকেট। জ্যাকেট ভেদ করে তার স্তনের বোঁটা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। আমাদের বন্ধুটি বার বার সেই দৃশ্য দেখছিল।

মহিলাটি পথ চলতে গিয়ে তার নিকটবর্তী হলো।

সজ্ঞান না অজ্ঞান কিছু বোঝা গেল না কেবল বুঝতে পারলাম আমাদের বন্ধুটির মস্তিষ্কের ভীমরতি। সে মহিলার পথ আগলে

দাঁড়ালো এবং তড়িৎবেগে 'বেহায়া' উচ্চারণ করে হাত দিয়ে স্তনের বোটা থেত্‌লে দিলো।

ততক্ষণে যক্ষদজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। কিল আর ঘুষি, ঘুষি আর কিলের বৃষ্টি শুরু হলো। তাদের ঘিরে অসংখ্য লোকের ভীড়।

তার অট্টহাসি এবং পাগলামির প্রতি তীর্যক দৃষ্টি হেনে সবাই চলে গেল।

সেদিন নিজের পরিধেয় কাপড়-চোপড় তাকে রীতিমতো ঘাবড়ে দিল। নিজের স্ত্রীর সামনেও একবার এরূপ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিলো। সেদিনকার ঘটনা মনে করে সে আবার অস্থির হয়ে উঠলো। মনে মনে ভাবলো, 'কি প্রয়োজন এসব কাপড়-চোপড়ের? কেন এসবের অন্তরালে নিজেকে বন্দী করে রাখা?'

হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো দু'হাত দিয়ে শরীরের সমস্ত কাপড়-জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ডাষ্টবিনে এখন সে আল্লাহ্‌ তাকে যেমন করে দুনিয়া ত পাঠিয়েছিলেন ঠিক তেমনি।

এখন সে স্বাধীন। মুক্ত। রাস্তায় নেমে অট্টহাসি হাসতে আর কোন বাধা নেই।....

ইউসুফ আল্ সাবায়য়া

ঘরেফেরা

একহারা দেহের গঠন মুখের লাবণ্যে পাণ্ডুবর্ণের ছটা। সব মিলিয়ে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন! সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে গিয়ে বার বার তার দেহের পানে তাকাচ্ছিলাম।

টানা টানা দুটো চোখে একজোড়া কালো পুত্তলি। আমার ঘরে প্রবেশ করা অব্দি তার চোখের পুত্তলি জোড়া কেবলি নাচছিল। একটুও স্থির হয়ে বসে ছিল না। কেমন চাঞ্চল্যে মুখর।

আমি কিন্তু একবাক্যে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করতে পারছি না। তার পরনে যদি ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় থাকতো তাহলে বলতে পারতাম সে গরীব ঘরের মেয়ে। চুলগুলো যদি বিনুনীবদ্ধ না থাকতো, ধরে নিতাম ছন্দহীন কবিতা। কিংবা কথাবার্তায় যদি অসংলগ্নতা থাকতো তবে নির্ঘাত বলে দিতাম, সে পাগলী।

সত্যি সে আমার কাছে এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন!

চুমকি দেওয়া নীলাভ শাড়ীপরা সেই মহিলা আমার সম্মুখে দাঁড়ালো দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা নমনীয়তা খেলা করছে মুখটা উপরের দিকে তোলা, ঠিক আমার চোখের কাছাকাছি

অতঃপর আস্তে করে বললো, আস্‌সালামু আলায়কুম, ডাক্তার সাহেব।'

ঃ 'ওয়ালাইকুম আস্-সালাম।' পাশের চেয়ারটায় বসার নির্দেশ দিয়ে বললাম, 'বলুন, কি আপনার অসুখ ?"

সরাসরি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে ডান হাতটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বাম কানের লতা পর্যন্ত উঠালো। অতঃপর সেখানে হাতের আঙ্গুল ঘষতে ঘষতে বললো, 'ডাক্তার সাহেব, এখানেই আমার যন্ত্রণা। কি যে যন্ত্রণা ডাক্তার সাহেব, আপনাকে তা বলবার ভাষা নেই আমার!'

ভালো করে পরীক্ষা করলাম। কিন্তু রোগের কোন চিহ্নই সেখানে আবিষ্কার করতে পারলাম না। অথচ তার চিন্তাক্লিষ্ট মনের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুললো। পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে প্যাডের উপর আঁকিবুকি আঁকতে আঁকতে বললাম, 'দেখুন, আপনর কোনো অসুখই নেই! আপনি দিব্যি সুস্থ। পরীক্ষা করে এমন কোন লক্ষণই পাইনি যা আপনার যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যে অন্ততঃ আপনি এক্স-রে করাতে পারেন। এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

আমার বক্তব্য শুনে মহিলার নৈরাশ্য চরমে উঠলো এবং কাতর-কণ্ঠে বলতে শুরু করলো, 'ডাক্তার সাহেব, বিশ্বাস করুন আমি সত্যি অসুস্থ আগে সপ্তাহে একবার বেদনা অনুভব করতাম। এখন সপ্তাহে দু'বার, তিনবার। উহ! কি যে অসহ্য যন্ত্রণা! মনে হয় আজরাইল যেন আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করে। ডাক্তার সাহেব, আপনার পায়ে পড়ি, আল্লার ওয়াস্তে আমাকে এমন একটা ঔষধ দিন যাতে আমার বেদনার উপশম হয়।'

ভাবছি, রোগ নির্ণয় করাই সম্ভব হলো না অথচ কি ঔষধ তাকে দেবো!

কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। ঔষধ না দিলেই নয়। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনে এমন একটা ঔষধের নাম লিখে দিলাম যা খেলে উপকার না হোক অন্ততঃ কোন ক্ষতি করবে না।

ফাওদিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন হাতে নিয়ে বিদায় হলো।

একমাস পর। ফাওদিয়া এক্স-রে রিপোর্ট হাতে নিয়ে আবার এসে হাজির। এবারে তাকে আরো বিমর্ষ দেখাচ্ছে। আগের চেয়ে আরও অসহায় এবং দুর্বল মনে হচ্ছে। তার হাত থেকে এক্স-রে প্লেটটা নিয়ে সূর্যের দিকে ধরে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে বললাম, 'এক্স-রে প্লেট একদম পরিস্কার। কোথাও দাগ নেই, রোগের চিহ্ন মাত্র নেই। বিশ্বাস করুন, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

: 'কি বলছেন, ডাক্তার সাহেব? আমি সুস্থ?' ফাওদিয়া একরূপ চীৎকার করে উঠলো।

: 'জী হাঁ, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং রোগটা আপনার মানসিক।'

: 'এ আপনি কি বলছেন, ডাক্তার সাহেব? এই গতকালও আমি বেদনায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম। ডাক্তার সাহেব, আপনার পায়ে পড়ি, আল্লার ওয়াস্তে আমাকে এমন একটা ঔষধ বাৎলিয়ে দিন যাতে আমার বেদনার উপশম হয়'

আমি হতভম্ব। তার এ ব্যবহার মোটেই সহ্য করতে পারছিলাম না। এবারেও তার শান্ত্বনার জন্য অন্ততঃ একটা ঔষধের নাম লিখে দিলাম।

মহিলা যে মানসিক রোগে আক্রান্ত তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। মানসিক রোগের চিকিৎসায় মনের অবস্থাকে জোরদার করা অপরিহার্য। ঔষধের সঙ্গে আরও একটা মালিশের নাম লিখে দিয়ে বললাম, 'এটা তুলো দিয়ে দিনে' তিনবার কানে লাগাবেন দেখবেন বাতাস যেন না লাগে।

কিছুক্ষণ সে কিসব ভাবলো। অতঃপর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রাজ্যের চিন্তা আমাকে ছেয়ে ফেললো। কেবলি ভাবছি, কি করে এ মহিলাকে বাঁচানো যায়! পেশা হিসাবে মানবতার সেবাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছি এবং এটাই আমার জীবনের পবিত্র ব্রত। এবং এ কারণেই নিজের বিবেকের দংশনে বার বার আহত হচ্ছিলাম যে, মহিলার চিকিৎসার কোন ঔষধ নির্ণয় আমার ডাক্তারী বিদ্যার বাইরে। আচ্ছা, আমি না হয়ে যদি অন্য কোনো বিবেকহীন লোভী ডাক্তার হতো! নিশ্চয়ই সে মহাচিকিৎসকের ভান করে মোটা টাকা পকেটস্থ করতো! কিন্তু আমার গত দশ বছরের ডাক্তারী-জীবন তো মহান দায়িত্ব এবং পবিত্র ব্রতের ভিত্তিতেই গড়া। সেখানে ফাটল ধরানো কি করে সম্ভব?

পরের দিন। চেম্বারে বসে আছি হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো রিসিভার তুলে বুঝতে পারলাম এক অশিক্ষিতা বৃদ্ধা মহিলার কণ্ঠস্বর সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো ডাক্তার সাহেব, আমার গৃহকর্ত্রী ভীষণ বেদনায় ছটফট করছে শীগগীর চলে আসুন'

১৯ নম্বর মোহাম্মদ আলী পাশা রোড, মোস্তফা আহমেদ মঞ্জিল —বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে সে টেলিফোন ছেড়ে দিল।

'মোস্তফা আহমেদ মঞ্জিল।'

বাড়ীটার নাম শুনেই বুঝতে পারলাম যে এটা শহরের সবচেয়ে ধনী এক মৎস্যব্যবসায়ীর বাড়ী। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ী নিয়ে রওয়ানা হলাম।

বাড়ীর গেটে গাড়ী থামতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল। গাড়ী থেকে নামতেই একজন চাকর এসে আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে আমার আগে আগে চললো। আমরা তিন তলায় পৌঁছলাম।

রোগিণীর কামরার নিকটবর্তী হতেই বুঁটি তোলা কালো চাদর গায়ে এক বৃদ্ধা মহিলা এগিয়ে এলো। আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, এই মহিলার কণ্ঠস্বরই আমি টেলিফোনে শুনেছি।

সে আমাকে সালাম জ্ঞাপন করে বিনীতভাবে বলা শুরু করলো, 'ডাক্তার সাহেব. আমাকে মাফ করবেন। আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম। আপনাকে টেলিফোন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গৃহকর্ত্রীর বেদনা থেমেছে। উহ্! কি যে যন্ত্রণা ছিল। আপনি যদি স্বচক্ষে দেখতেন!'

দরজার পাশেই রোগিণী দাঁড়িয়েছিল। তার আপাদমস্তক একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করলাম। মুখ ফ্যাকাশে। ঠোঁট নীলাভ। চোখ জোড়া নিমিলিত।

আমি একদম পাথর বনে গেলাম। তার চেহারা দেখে মনে হলো যেন অস্থির আত্মা দেহের খাঁচা ছেড়ে উধাও হতে চলেছে

তার কক্ষের আসবাবপত্রে অনিয়মের রাজত্ব। বিছানা বালিশ এলোমেলো। চাদর কোচকানো সব মিলিয়ে একটা নৈরাশ্যের ভীতিচিহ্ন।

রোগিণীকে শোয়ার নির্দেশ দিয়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম। কোনোকিছু জিজ্ঞেস না করে নাড়ী পরীক্ষা করলাম। নাড়ীর 'বিট' খুব দ্রুত। হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। মুখ জড়িয়ে যাচ্ছে। কথা বের হতে চায় না।

ততক্ষণে তার হাত-পায়ে খেঁচুনী শুরু হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে একটা ইন্‌জেক্‌শান দিলাম।

কিছুক্ষণ পরই সে চোখ মেলে চাইল। চোখে মুখে বেদনা উপচে পড়ছে। অন্তরে যেন সাহারার জ্বালা।

হঠাৎ ঠোঁট দু'টো নড়ে উঠলো। সে বিড় বিড় করে বলতে শুরু করলো, 'ডাক্তার সাহেব, আমাকে বাঁচান! দোহাই আপনার, আমার জন্য একটু ভালো করে চেষ্টা করুন!'

ডান হাতটা বাম গালে স্থাপন করে আমার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এক নিঃশ্বাসে সে বলতে থাকলো, 'হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব, আমার গালের এই অংশ কেটে ফেলুন। আমার যন্ত্রণার কীট এখান থেকে বের করে দিন। আমার চেহারার বিকৃতিকে একটুও ভয় করি না। জীবন যেখানে অশান্তির আগুনে দগ্ধিভূত, সেখানে দেহের বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং লাবণ্য উপহাস মাত্র। আমি শান্তি চাই···শান্তি চাই···শান্তির কাছে দৈহিক সৌন্দর্য কিছুই নয়। দেহের এ অংশটা আপনি নির্ভয়ে কেটে দিন।'

: 'কেন এই আজে বাজে বকছেন? ধৈর্য ধরুন। এই ঔষধেই ইন্‌শা-আল্লাহ্ ভালো হয়ে যাবেন। একটু ধৈর্য ধরুন।'

: 'ধৈর্য আমাকে বাঁচাতে পারবে না, ডাক্তার। আমার চিকিৎসার প্রয়োজন। ঔষধ দিয়ে আমাকে সারিয়ে তুলুন। নইলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।'

আমার ডাক্তারী বিদ্যার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও কোন ফায়দা হলো না। বেদনা ক্রমশঃ বেড়েই চললো। এই ডাক্তারী জীবনের দশ বছরে এমন জটিল কেস আমি দ্বিতীয়টি পাই নি। আল্লার ভয়, আইনের শাসন এবং বিবেকের দংশন যদি আমার না থাকতো তা'হলে একটি মাত্র মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন, ব্যস্। ওর জীবন শেষ করে দিতাম। সকল দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতো সে।

বৃদ্ধা আয়া কাঁদতে কাঁদতে অতি বিনয়ের সুরে বললো, 'ডাক্তার সাহেব, যে করেই হোক আমার কর্ত্রীকে বাঁচান।'

কিছু না বলে আমি মাথাটা ঝুঁকিয়ে ভাবতে লাগলাম। এবারে আরও একটা ইন্‌জেক্‌শন দিলাম। যন্ত্রণা কমে গেল। চোখ দুটো আস্তে আস্তে বুজে এলো। ততক্ষণে সে ঘুমিয়ে গেছে। ·· ···

নীচে নেমে এসে সবেমাত্র লন পেরুচ্ছি আবার সেই বুকফাটা চীৎকার শোনা গেল। আমার পা-জোড়া আপনা থেকেই নিশ্চল হয়ে এলো। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সিঁড়িভেঙ্গে আবার উপরে উঠে এলাম। চেয়ে দেখি ফাওদিয়া ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো ছটফট করছে। চোখ দুটি কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট দুটো কামড়াচ্ছে আর হাতের নখ দিয়ে বাম কানের লতিকা ছিঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে।

আমি ব্যর্থ। আমার ডাক্তারী জীবন নিষ্ফল। আসলে আমি কিছুই করতে পারছি না। আসলে আমার দ্বারা তার কোন উপকারই হচ্ছে না।

আমি ফাওদিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝুঁকে পড়ে তাকে ভালো করে দেখতে থাকলাম। ফাওদিয়া নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে। একটু পরে জ্ঞান ফিরে আসলেই সে পাগলের মতো আমার হাতটা ধরে ফেলে বলতে শুরু করলো, 'আমি আপনাকে ছাড়বো না ডাক্তার। আমাকে অপারেশন করতে হবে। আমার এই রূপসী চেহারার দরকার নেই, কানসহ গোটা বাম গালটাই কেটে ফেলুন।'

শেষ পর্যন্ত অপারেশনের কথাই আমাকে ভাবতে হলো। অপারেশনের যন্ত্রপাতি ঠিক করে অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বেরিয়ে পড়তেই পেছন দিক থেকে বৃদ্ধা আয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ডাক্তার সাহেব।'

পেছন ফিরে তাকাতেই সে আমাকে ইশারায় ডেকে পাশের কক্ষে নিয়ে গেল এবং আমাকে অনুরোধ জানালো এইজন্যে যে, যেন তার বক্তব্য গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনি।

তাকে অভয় দিলে সে বলতে শুরু করলো: 'ডাক্তার সাহেব, আপনি তাকে অপারেশন করতে যাবেন না। ওতে কোন ফল

হবে না। বরঞ্চ মাঝখান থেকে তার রূপসী দেহটা বিচ্ছিরি হবে। এর অসুখের মূল কারণ আমি জানি।'

: কি এর কারণ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

: ফাওদিয়ার কানে ব্যথার সূত্রপাত একটি চড়ের আঘাত থেকে।

: কিসের চড়? এ কি বলছো তুমি? উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

: জ্বী, ডাক্তার সাহেব। একটি মাত্র কড়া চড়। এবং এই চড়ের নায়ক তার একমাত্র ছেলে।

: কি? তার আবার ছেলে আছে নাকি?

: জ্বী, হাঁ। তার শুধু ছেলে নয়, স্বামীও আছে। ফাওদিয়া নিজের ইচ্ছায় তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে।

বৃদ্ধা আয়ার মুখে নিম্নের এই কাহিনী শুনলাম।

আমার মনিবপত্নী অর্থাৎ ফাওদিয়া তামের (পরে আহমদ) সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের মেয়ে। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তিনি লালিতা-পালিতা হয়েছেন তাঁর বাবাই ছিলেন আমার আসল মনিব। এই কয়েক বছর হল তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি নিজের স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যার জন্য রেখে গেছেন অজস্র ধন-সম্পত্তি। সেই সঙ্গে তাঁর আভিজাত্য এবং মানবতাবোধ। এতদঞ্চলে সেসব কিংবদন্তীর মতো প্রচলিত।

ফাওদিয়া তামের বয়োপ্রাপ্তা হলেই তাঁর মা তাঁকে নিজের পছন্দমতো বর বেছে নিতে অনুমতি দিলেন। ফাওদিয়া করলেনও তাই। তিনি নিজেরই সমঅনুপাতের এক সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারের এক সুদর্শন যুবককে বিয়ে করলেন।

একদিন ফাওদিয়া সুন্দর এবং সুখী জীবনের কামনায় স্বামীর ঘরে চলে গেলেন। তাদের দাম্পত্যজীবন ঝগড়া-কলহের উর্ধ্বে।

সেখানে এক অনাবিল স্বর্গসুখ বিরাজ করতে থাকলো। কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের ঘরে জন্ম নিল এক সুন্দর ফুটফুটে পুত্রসন্তান।

এমন সুখী পরিবার কায়রোর মাহাম্মদ আলী পাশা রোডে আর দ্বিতীয়টি ছিল না অথচ কেউ কি কোনদিন কল্পনা করতে পারতো যে, এমন সুন্দর অনাবিল সুখ সম্পর্কেও ধ্বংসের ছায়া নেমে আসবে?

ফাওদিয়ার স্বামীর বন্ধু ফিরোজ জীবন্ত একটা শয়তানের রূপ ধরে এই পরিবারে প্রবেশ করলো। আর নিষ্পাপ এবং সরল ফাওদিয়া হলেন সেই ফিরোজের মিথ্যা প্রেমের শিকার। ফিরোজ কবি এবং শিল্পী। সম্প্রতি লণ্ডন থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছে। তথাপি ফাওদিয়ার স্বামী আহমদের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না।

যখন এ বাড়ীতে আসি ফাওদিয়া তখন সবেমাত্র শিশু। তাকে কোলে কাঁখে করে মানুষ করেছি। কাজেই তাঁর চরিত্র সতীত্ব এবং মেজাজ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, আর কেউ ততটা জানে না।

কসম খেয়ে বলতে পারি ডাক্তার সাহেব, তাঁর স্বামীকে খুশী করার পক্ষে তাঁর কোন ত্রুটির অবকাশ ছিল না কিন্তু বড়ই আফসোস! শয়তান ফিরোজই তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে প্রতারণা করছে। এবং এই প্রতারণার জালই ফাওদিয়ার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেককে গ্রাস করে ফেললো। প্রতারণার দ্বন্দ্বে ফাওদিয়া আন্দোলিত। এবং এই আন্দোলন ফাওদিয়ার জীবনকে সম্পূর্ণ উল্টে দিলো। শয়তান যে মানুষের পুরনো শত্রু ফিরোজ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এই মিথ্যে প্রেমের মহড়া যদি বিয়ের আগে চলতো, তবে বিয়ের মাধ্যমেই ভণ্ডামির মৃত্যু ঘটতো। কিন্তু বড়ই বিপদের কথা

যে, ফাওদিয়া বিবাহিতা। শুধু বিবাহিতা নয়, একজন সন্তানের মা। তখন যে তার সম্মুখে কোন পথই খোলা ছিল না। একটি মাত্র উপায়—সন্তান এবং স্বামীকে ত্যাগ করে ফিরোজের অঙ্কশায়িনী হওয়া। কিন্তু তার পরিণতিও যে ভয়াবহ!

ফাওদিয়া নিজের নীতিতে অটল। মিথ্যার বেসাতি তার কাম্য নয়। সে স্বামীকে স্পষ্ট বলে দিল যে, ফিরোজের প্রেমে সে অন্ধ। অতএব, তালাকপ্রার্থী।

স্বামীর মাথায় নির্মেঘ আকাশ থেকে বাজ পড়লো। তিনি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর বলিষ্ঠ পৌরুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, ভাঙ্গা সংসার আগলে রেখে লাভ কি? তিনি এক শর্তে রাজী হয়ে গেলেন, সন্তানের উপর ফাওদিয়ার কোন দাবি থাকবে না।

ফাওদিয়ার চোখের পর্দা তখন ফিরোজের ভণ্ড প্রেমের জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে তিনি সন্তানের উপর থেকে দাবির হাত তুলে নিলেন।

ফাওদিয়া তখন এক ভিন্ন জগতের অধিবাসিনী। দু'চোখের রঙীন স্বপ্ন কিছুদিন তাঁর বাস্তবজীবনের ভিত্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। কিন্তু আবেগ, প্রেম এবং উন্মত্ততার ঘোর কয়েকদিনের মধ্যেই কেটে গেল। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যের পর আবার সেই শান্ত পরিবেশ।

আমাদের ধারণাই শেষপর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হলো।

ম্যাজিকের মতো অতি দ্রুত ফাওদিয়ার নিজের জীবনের প্রতি তিক্ততা এসে গেল। প্যারিসের রাতের রঙীন স্বপ্ন এবং সুখময় জীবনের সোনালী ভবিষ্যৎ একজন অবিবেকী শয়তানের স্পর্শে সম্পূর্ণ উবে গেল। সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়া থেকে যেন তাকে একেবারে নীচে ফেলে দেয়া হলো। তার জীবনটাই এখন নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতার করুণ চিত্র।

শেষ পর্যন্ত ফাওদিয়া এবং ফিরোজের দাম্পত্যজীবন টিকে নি। বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফাওদিয়া বাপের বাড়ীতে চলে এসেছে।

কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। বৃদ্ধা আয়া দু'চোখে অশ্রুর প্লাবন এনে আবার বলা শুরু করলো, 'ডাক্তার সাহেব, আসল ঘটনা এখনও বলা হয় নি। পরবর্তী ঘটনাই সব চেয়ে হৃদয়বিদারক।'

: 'কি রকম?'

: কিছুদিনের মধ্যেই ফাওদিয়ার মা হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন। কেবল এ সংসারে বাকী রইলাম আমি। আমার দুর্ভাগ্য, ফাওদিয়াদের বংশের অতীত গৌরবের অনুশোচনা করতেই বোধ হয় বেঁচে রইলাম!

বৃদ্ধা আয়ার দৃষ্টি তখন অতীতের গৌরবময় স্মৃতির প্রাসাদে নিবদ্ধ। সে দু'চোখের পানি মুছতে মুছতে বলা শুরু করলো:

ফাওদিয়া অহঙ্কারী, গর্বিতা এটা সত্য। এবং এই সত্যের খাতিরেই কারো প্রতি সে কোনদিন অভিযোগ করে নি। আমি তার দুঃখে অশ্রুভারাক্রান্ত। এমন নিটোল চোখজোড়া কেন যে সবসময় পানিতে ডুবে থাকে, সব বুঝি। এমন ফুলের মতো সুন্দর শরীর শুকিয়ে কেন যে কালো হয়ে গেছে, তাও জানি।

ফাওদিয়ার চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে কেবলি ছটফট করে আর চাঁদের মাঝে কলঙ্কের হেতু অন্বেষণ করে।

হ্যাঁ, আমি জানি এখন তার একমাত্র কাম্য সেই সন্তান ঘরমুখো হোক, তার কোলে ফিরে আসুক। স্বামীর স্মৃতিও যে তাকে দহন করে না এমন নয়। কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কাছে সে পরাজিত। নিজের ভুলের জন্য মাফ চাবে, এটা তার কাছে অকল্পনীয়।

একদিন তার স্বামীর কাছে গেলাম। ফাওদিয়ার মৃত বাপের নামে শপথ করে বললাম যে, ফাওদিয়ার পুত্র আদনানকে যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি তিনি দান করেন।

আহমদ সাহেব ক্ষেপে গেলেন। তিনি আমাকে শাসিয়ে দিলেন যে, এরূপ অন্যায় আবদার নিয়ে আমি যেন তাঁর কাছে কোনদিন না যাই।

বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এই কথা ফাওদিয়ার কাছে বললাম না। এতে পুরনো ক্ষতে আরও ব্যথা পাবে, এই ভেবে।...

দিন যতই গড়াতে লাগলো সন্তানের বিচ্ছেদ-বেদনার কীট ফাওদিয়াকে ততই কুরে কুরে খেতে শুরু করলো। একদিন সে আমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিলো। আমার মাঝে সে পুত্র-স্নেহের সান্ত্বনা খুঁজছিলো।

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, যে করেই হোক পুত্র আদনানের সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দোব।

এক উপায় খুঁজে বের করলাম। আমি ও ফাওদিয়া ছাড়া এ কথা কেউ জানতো না। এমন কি আহমদ সাহেবও এর বিন্দুবিসর্গ টের পান নি।

আদনান যে স্কুলে পড়তো আমি তা চিনতাম। একদিন আমি ও ফাওদিয়া গোপনে সেই স্কুলের গেটের কাছে অপেক্ষা করতে থাকলাম। স্কুল ছুটির পর ছেলেরা যখন বেরুচ্ছে তখন আমি আদনানকে দেখিয়ে ফাওদিয়াকে ইশারা করলাম।

ফাওদিয়া ছেলের নাম ধরে ডাকলো। নিজের নাম শুনে আদনান এগিয়ে এলো।

আদনান অনেক বড়ো হয়ে গেছে। ফাওদিয়া আবেগে অস্থির হয়ে আদনানকে জড়িয়ে ধরলো।

আদনান হতভম্ব হয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'তুমি কে?'

: আমি তোমার মা।

: মা? আদনান অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে উচ্চারণ করলো। এবং ডান হাতটা ঘুরিয়ে কষে এক চড় বসিয়া দিল ফাওদিয়ার বামকানসংলগ্ন গালে। তারপর এই বলে গাড়ীতে উঠে পড়লো, 'তোমার মুখ দেখাও অন্যায়। আমার মা নেই। সে মারা গেছে··· ।'

ফাওদিয়া দুঃখ ও বেদনার প্রতিমূর্তি হয়ে ঘরে ফিরলো। কয়েকদিন কথাবার্তা একদম বন্ধ। খাওয়া-দাওয়া নেই। তারপর এই অসুখের সূত্রপাত। মৃগী রোগীর মতো বেহুঁশ হয়ে সংজ্ঞা লোপ পায়। সংজ্ঞা ফিরে পেলেই বাম গালের কানের কাছে নিজহাতে বারবার চাপড়াতে থাকে। ডাক্তার সাহেব, আপনিই বলুন এর পরেও কি তার অপারেশনের প্রয়োজন?

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে নিশ্চুপে বিদায় নিলাম। আমার মস্তিষ্কে তখন রাজ্যের ভাবনার পোকা কিলবিল করছে। ফাওদিয়া মানসিক রোগগ্রস্তা। ঔষধে এর কোন ফায়দা হবে না।...তার শান্তির প্রয়োজন...মানসিক শান্তি ··· ।

ভাবছি। আমি তো শুধু ডাক্তার নই, মানুষও তো বটে। রক্ত-মাংস বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ফাওদিয়াকে বাঁচাতে হবে। মানুষ হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা আহমদের ওখানে চলে গেলাম। সামান্য কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম আহমদ সাহেব ধনী সম্পন্ন পরিণতবুদ্ধির মানুষ। তাই কোন ভূমিকা না করে সমস্ত ঘটনা অকপটে খুলে বললাম।

: তা হলে আমার কি করণীয় আছে? আহমদ সাহেবের প্রশ্ন।

: আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। ভুলের অন্ধকারের আড়ালেই সংশোধনের আলো দীপ্তি নিয়ে প্রতিভাত। সেই আলোক দিয়ে ভুলের অন্ধকার বিনষ্ট করাই মহত্ত্বের লক্ষণ, ক্ষমার আদর্শ। আপনার স্ত্রীর পদ-স্খলনের জন্য আপনিও সমানভাবে দায়ী। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার বন্ধুর উপর বিশ্বাস করে নিজের যৌবনবতী সুন্দরী স্ত্রীকে তার সঙ্গে এরূপভাবে মেলা-মেশা করতে দেওয়া আপনার মোটেই উচিত হয় নি। বলুন, সত্যি কি না? আমার কথার জবাব দিন। যাহোক, আপনার ছেলের মুখ চেয়ে, মনুষ্যত্বের খাতিরে আপনি ফাওদিয়াকে ক্ষমা করে দিন। নিজের ঘরে ফিরে যান।

: আচ্ছা, না হয় তাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু তাতেও তো আপনার চিকিৎসাবিদ্যা সেখানে ব্যর্থ!

: আপনার ক্ষমা এবং ঘরে ফেরাই সবচেয়ে বড়ো ঔষধ। এই ঔষধ প্রয়োগ করবার সুযোগ আমাকে দিন। ফাওদিয়া নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।

: আমি তো তাকে বহু আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। আদনান তার অমর স্মৃতির জ্বলন্ত স্বাক্ষর। ওকে নিয়েই তো বেঁচে আছি ···।

আহমদ সাহেবের দীর্ঘশ্বাসের গরম হাওয়া আমার গায়ে এসে লাগলো। তিনি স্থিরচিত্তে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, ঘরে ফেরার সময় এখনো আসে নি।'

পরের দিন চেম্বারে বসতে না বসতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। ফাওদিয়া বেগমের বৃদ্ধা আয়ার কণ্ঠস্বর, 'ডাক্তার সাহেব, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ফাওদিয়া এবার আত্মহত্যা করতে উদ্যত। শীগ্‌গীর আসুন।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আমি সোজা গাড়ী হাঁকালাম আহমদ সাহেবের বাসায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ সাহেব কোন দ্বিধা

না করে আদনানকে সঙ্গে নিয়ে উঠে এলেন আমার গাড়ীতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা তিনজন পৌঁছে গেলাম ১৯ নং মোহাম্মদ আলী পাশা রোডের মুস্তফা মঞ্জিলের সামনে। তিনজনই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরের তলায় গিয়ে দেখি ফাওদিয়া কঠোরভাবে নিজের কান ধরে পীড়ন চালাচ্ছে।

ফাওদিয়ার হাতটা সরিয়ে দিয়ে তার কানটা টেনে ধরে বললাম, 'এবার মালিশ নিয়ে এসেছি। চেয়ে দ্যাখো, বোকা কোথাকার!'

ফাওদিয়া চীৎকার করে আদনানকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'বাবা, আ·ার বাবা এসেছো।'

আদনান আস্তে আস্তে মায়ের বাম কানের কাছে হাত বুলাতে থাকলো।

আহমদ সাহেবের চোখে তখন আনন্দের অশ্রু।

টেলিফোনে আর কোনদিন বৃদ্ধা আয়ার কণ্ঠ শোনা যায় নি।

ইউসুফ শারোনী

দারাইব গলি

শুক্রবার

মাহতুব সারাটা সকালই কাটাল বিশ্রী কাজের মধ্যে। উঠোনে এসে দেখলো স্তূপের মতো পিঁপড়ের ঢিবি। ঢিবিগুলোতে জল চাললো। পিঁপড়ে ডুবালো জলে এবং মধ্যে থেকে কি করে পিঁপড়ে বেরিয়ে আসে সেই দৃশ্য দেখতে থাকলো।

হঠাৎ কি খেয়ালে তার আনন্দ ধরে না। উঠোনের অন্য দিকে আরও পিঁপড়ের ঢিবি। ছোট-বড়, লাল-কাল পিঁপড়েয় ভর্তি সেই ঢিবি। সারাটা সকালই এইসব ঢিবি জলে ভিজিয়েছে। পিঁপড়ে ডুবিয়েছে। আবার পিঁপড়ে বেরিয়ে আসার পথ বন্ধ করার আনন্দে কাটিয়েছে। আর এই কাজ তাকে রীতিমত ভাবুক বানিয়েছে।

আগের দিন রোজকার নিয়মে সে আদালতে গিয়ে চেঁচিয়ে হাঁক ছেড়েছিলে: আদালতে বিচার শুরু হয়েছে, আসামী হাজির ……। আর সেই সঙ্গে শুনছিল সিঁদেল চোর, নেশাখোর, বদমাস, খুনী, বেশ্যা এবং সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের বিচারের রায়। যে পর্যন্ত সে আদালতে এই দারোয়ানের কাজ করছে, তাকে শুনতে হয়েছে কতসব বিশ্রী কাহিনী এবং দেখতে হয়েছে সমাজের নোংরা গলদ। সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে একটি দিনও বাদ যায় নি।

একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি দেখতে হয় নি। প্রত্যেকটি ঘটনা অভিনব, আশ্চর্য এবং যার কোন পরিসমাপ্তি ছিল না।

এই এক বছরে গতকাল পর্যন্ত তাকে সাতবার মৃত্যু ঘোষণা শুনতে হয়েছে। ঘোষণাটি বিচারকের কয়টি কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। গতকালের ঘোষণাটি তাকে প্রথম আঘাত করলো। সে ভাবলো অষ্টমবারের মতো আর একটি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়ত সে শুনতে পারে।

গতকাল যে লোকটির ফাঁসি হলো তার বয়স বত্রিশ। ঠিক তারই সমবয়সী। লোকটা সজ্ঞান, ধূর্ত এবং ধীরস্থির। ছোট নাক। মেয়েদের নাকের মতো সরু, পাতলা। মায়াময় একজোড়া চোখ। প্রাণদণ্ডের সময় সে বিচারকক্ষের চারিদিকে উদাসভাবে তাকিয়ে খুঁজছিল বাঁচার কোন পথ পাওয়া যায় কি না। অথবা অন্য কাউকে দেখছিল, যে তার দুঃখের দিনে এগিয়ে আসবে সহানুভূতি দেখাবার জন্যে।...

এই মামলার এটাই ছিল পঞ্চম এবং শেষ তারিখ। অপরাধী যুবকের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রদান করা হলো: স্বামী বাড়ী গিয়ে দেখলো তার স্ত্রীর সঙ্গে যুবক পুরুষটি এক বিছানায় শুয়ে আছে।

স্বামী রাগে ফেটে পড়ল। এক লাফে যুবকের গলা ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে গলাটিপে মারবার চেষ্টা করলো।

আর যুবকটি তখন পকেট থেকে ছোরা বের করে সোজা চালিয়ে দিল স্বামীর বুকে। স্বামী তখনই শেষ।

স্ত্রীলোকটি বিচিত্র বিন্যাসে উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়ে দিল। তার দুঃখ স্বামীর শোচনীয় মৃত্যু নয়—প্রেমিকের ভবিষ্যৎ শাস্তির সম্ভাবনা।

বাংলাদেশ

চীৎকার শুনে প্রতিবেশীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখলো যুবকটির হাতে মুষ্টিবদ্ধ ছোরা।

স্ত্রীলোকটি সমস্ত ঘটনা খুলে বললো।

যুকবটি সব কিছু অস্বীকার করতে যাচ্ছিল কিন্তু রক্তাক্ত কাপড় এবং মুষ্টিবদ্ধ ছোরাই প্রমাণ করলো যে, সে হত্যাকারী, দোষী।

মাহদুব মনে করলো, আজকে বিকেলে তার হোসনিয়ার ঘরে যাবার কথা। আচ্ছা, হোসনিয়ার বাবা যদি তাদেরকে এই অবস্থায় একত্র দেখতে পায় তবে কী দশা হবে? তা'হলে সে অষ্টম অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়ে বিচারকের সামনে কি মৃত্যুর জন্য দাঁড়াবে না?

মধ্যাহ্নের ঘুম ভাংলো। সে শুনতে পেলো তার মা বাইরে তরকারি বিক্রেতার সঙ্গে ঝগড়া করছে। এটা নতুন নয়। প্রতি-দিনই তার মা এবং দারাইব গলির অন্যান্য প্রতিবেশীরা তরকারি বিক্রেতার সঙ্গে এই রকম কথাকাটাকাটি করে। এমনকি, উম্মে হাসানের সুস্বাদু হালুয়া বিক্রীর সময়ও ঝগড়া হয়। যদিও উম্মে হাসান একই গলির পূর্বপ্রান্তে বাস করে।

মাহদুব তার মাও তরকারি বিক্রেতার ঝগড়া খুব মন দিয়ে শুনছিল। তার মা বলছে: ছয় আঁটি সিমের দাম পাবে মাত্র দশ পয়সা।

বিক্রেতা উত্তেজিত হয়ে বলছে: না, না, বার পয়সার এক কানাকড়ি কমেও দেব না।

মাহদুবের মায়ের যুক্তি ছয় আঁটি একসঙ্গে কিনলে একটু সস্তা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিক্রেতার অভিমত, যত আঁটিই কিনুন না কেন, দু' পয়সা সে লোকসান দিতে পারবে না।

এই ঝগড়ায় মাহদুবের মন বিচিত্র অথচ পরস্পর জড়িত অনেক ভাবনার গভীরে ডুব দিলো। নিজেকে অসম্মান, ঘৃণা এবং

ধিক্কারের পাত্র বলে মনে হলো। এইসব দুশ্চিন্তার মাঝখানে দারাইব গলির একটা নোংরা চিত্র ভেসে উঠল। যেখানে দুর্গত পাঁক, ঘিনঘিনে মাছির ঝাঁক, ছেলেমেয়েদের নাক, মুখ এবং চোখের সামনে অসহ্য বিরক্তির সূচনা করে। ঠিক যেন ঘরের বাহির এবং ভিতরের ঝগড়ার মতই অস্বস্তিকর। জন্মের শুরু থেকে রাতের দুঃস্বপ্নের মতো এইসব ঘটনা তার মনে এক অপরূপ ক্রিয়া করছে।

মনে পড়লো, আজ হোসনিয়ার কাছে তার যাবার কথা আছে। এই নিয়ে একপক্ষ কাল ধরে সে কেবল ভেবেছেই। নিজেকে ভাল করে তৈরী করে নিতে প্রায় মাসখানেকের কাছাকাছি হলো। তার ধারণা মানুষ দুই প্রকারের: প্রথম, যাদের স্ত্রী আছে এবং দ্বিতীয়, যাদের স্ত্রী নেই।

দ্বিতীয় দলের পর্যায়ভুক্ত হতে তার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। না খেয়ে কিংবা সামান্য ফলমূল খেয়ে সে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিতে পারবে, আপত্তি নেই। কিন্তু রতি উপবাস সে মোটেই সহ্য করতে পারবে না। এই ব্যাপারেই তার সাথে অন্য দশজনের বেমিল। তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল গতকালের সেই মৃত্যু-দণ্ডের কথা ···।

মাহদুব উম্মে হাসানের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখে সে একটা কার্ড ঝুলিয়ে রেখেছে। তাতে লেখা: এইই, আমার আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

সুস্বাদু হালুয়ার সুঘ্রাণ তার নাকের মাঝখান দিয়ে অন্তরে ঢুকলো। উম্মে হাসান তার ছোট ছেলে মুহম্মদকে থাপড়াচ্ছে আর ছেলেটা নিরাশ হয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

গলি বেয়ে মাহদুব চলছে তো চলেছেই। বড় রাস্তায় এসে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। শুকনো বাতাসে তার ফুসফুস ভর্তি।

দুটো চোখ বাড়িয়ে সে সুন্দর পোশাকে সজ্জিতা রূপসী মেয়ে দেখছিল।

যাত্রীভর্তি ট্রাম এলো। লোহার ডাণ্ডা ধরে সে ঝুলে পড়ল। এবং সামনের দিকে আস্তে আস্তে পথ করে নিয়ে দেখে সে প্রথম শ্রেণীতে পৌঁছে গেছে। তার পাশে একজন মোটা যাত্রী। পরনে শাদা জ্যাকেট, টেকো মাথা এবং কপালের কাছে একখণ্ড ঝুলানো মাংস।

মাহদুব দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা দরজা খুলে ভীড়ের মধ্যে বসবার জায়গা নিচ্ছে এমন সময় একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটল। এক বৃদ্ধ শরীরের ঘাম ঝেড়ে সিট ছেড়ে উঠে গেল আর মাহদুব চট করে সেখানে বসে পড়ল। তার পাশেই একজন বোরখা-আবৃত সুন্দরী তরুণী। তরুণীর একটা হাত ছিল অনাবৃত এবং কাল বোরখার ফাঁক দিয়ে তার শরীরের উজ্জ্বল অংশ এক উত্তেজনার সৃষ্টি করল। মাহদুব একটু ঘেঁষে তার শরীরের কোমলতার স্বাদ পাচ্ছে এবং চুপি চুপি নিজের একটা হাত অজ্ঞাতসারে মেয়েটার হাতের সাথে ঠেকাবার চেষ্টা করছে। মাহদুব অনুভব করলো মেয়েটার এতে কোন আপত্তি নেই। তার কাছে ঘেঁষে বসতে পারায় নিজেকে জয়ী মনে করল এবং আনন্দের আমেজ চোখে মুখে ফুটে উঠল।

অন্যপাশে একজন যুবক জামা-কাপড় ঠিক করে সান্ধ্য সংবাদ জানবার জন্যে খবরের কাগজে ডুবে আছে। মাহদুব আস্তে করে তরুণীর গায়ে চাপ দিলো এব পাশের ভদ্রলোকটির কাগজের দিকে হেডলাইন দেখার ভান করলো। পাশের অন্য লোককে কাগজ পড়তে দেখলেই মাহদুব সকাল বিকাল এইরকমই করে থাকে।

অবশেষে একটা টুকরো খবর তার নজরে পড়লো। রাসআল-বার-এর সংস্কারের জন্য সরকার এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা

মঞ্জুর করেছেন। নিজের সংসার নির্বাহের জন্য সরকার যদি তাকে এক হাজার টাকা দিত—মাত্র এক হাজার টাকা! তা'হলে সে বিয়ে করতো এবং বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে নানারূপ বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না। এসব যেন তাকে মোটেই মনের শান্তি দিতে পারে না। আর যদি দারাইব গলি সংস্কারের জন্য দেড় হাজার টাকা পাওয়া যেত!

তার বাবা থাকেন আল দামিয়াত্তা। শৈশব থেকেই মাহহুবের তা মনে আছে। মাঝে মাঝে সে সেখানে যেতো। এখনও তার মনে আছে সাউক আল্ হিস্‌বার কথা। আর সেই শায়েখ মোহাম্মদের কথা। তিনি পরিধান করতেন চটের পোশাক। গলায় বুলাতেন লোহার চেন। লোকজন তাঁর কাছে আশীর্বাদের জন্য ভীড় করত।

মাহহুব তার বাবার সাথে মাঝে মাঝে রাসআল-বার-এ বেড়াতে যেতো। রাসআল-বার গ্রীষ্মের মওসুমে স্বাস্থ্যনিবাস। তার ধারণা সেটা সংস্কারের জন্য একটা পয়সারও দরকার নেই। অথচ দারাইবের কানা গলি ……।

সে তার সিট থেকে উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলো পাশের মেয়েটা যাবার আয়োজন করছে। ঠিক সেই সময়ে ট্রামের চালক একজন ছোকরার সাথে ঝগড়া শুরু করল। সে ট্রাম থেকে চট করে নেমে সোজা হোসনিয়াদের বাড়ীর রাস্তা ধরল। বড় রাস্তাটা পার হয়ে ছোট গলির মধ্যে ঢুকতেই তার মনে কেমন একটা চিন্তার উদ্রেক হলো। ভাবল, তার সেই উঠোনে ফিরে গিয়ে পিঁপড়ের ঢিবি ডুবানো আলো, তবে এবারে গরম জল দিয়ে।

হোসনিয়ার সান্নিধ্যে যেতে তার মন চাইলো না। তার মন চাইছে নতুন পরীক্ষায় নিজেকে নিমগ্ন করতে। তথাপি সে চলল, সে হোসনিয়ার বাবা আম্‌ম আলীর পাশ কাটাল।

লোকটা একটা কাঠের গুঁড়িতে তার প্রিয় জায়গায় বসে পুরনো জুতো মেরামত করছিল, আর একজন ভদ্রলোক তার পাশে জুতোর জন্য দাঁড়িয়েছিল।

মাহহুব আম্‌ম আলীর দিকে ভালো করে একবার তাকাল।

আম্‌ম আলী বৃদ্ধ, সাদা চুল এবং ঘন দাড়িতে চোয়াল ভর্তি।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে তাকে খুন করে হোসনিয়াকে অবাক করে দিতে পারত। অবমাননা, ঘৃণা এবং অস্বস্তিকর একটা চিন্তা তাকে দ্বিতীয়বারের মত ছেয়ে ফেললো এবং সেই পরিবেশ যে-কোন মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল এবং পাগল করে দিতে পারত।

মাহহুব দেখলো হোসনিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। গালভরা হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। তার চোখে ছিল কামনার অগ্নি। সারা মুখমণ্ডলে দারিদ্র্য এবং দুঃখের করুণ ছাপ।

ঘরে ঢোকার সাথে সাথে একটা আশ্চর্য গন্ধ তার নাকে এলো। অদূরে ধূলাবালিতে হোসনিয়ার ছোট ভাই খেলা করছে এবং তার পেছনে হলদে রংয়ের আবর্জনা।

হোসনিয়া দৌড়ে গিয়ে একখণ্ড কাগজ নিয়ে এলো সেই ময়লা পরিষ্কার করতে। তার চুলগুলো নরম এবং বিলাসী আর ঘাড় বাঁকালে ছেঁড়া লাল জামার ফাঁকে তার পুষ্ট দেহটি ভারী সুন্দর দেখাত।

হোসনিয়ার অভ্যর্থনা চলছেই।

মাহহুব তার পাশে আলতো করে বসলো এবং সেদিনের সেই ফাঁসির ঘটনাটি তার কাছে ব্যক্ত করল এই জন্যে যে, হোসনিয়া যেন এতে ভয় পায়।

ভয়তো দূরের কথা, হোসনিয়া মাহহুবের পাশ ঘেঁষে আরও ঘনিষ্ঠ হলো যেন সে নরম করে তাকে একটা চুমো দেয়।

সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তার এই অভিসার চলছে। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও সে ভাবতে পারে নি যে, তার একজন নিজস্ব রমণী আছে। মনে পড়লো রাসআল-বার। যদি সে সেখান থেকে একজন সুন্দরী মহিলা পেত, কী আনন্দই না হতো! কিন্তু এটা তার পক্ষে অবাস্তব, কল্পনার বাইরে। তার জীবনে এর চেয়ে নতুন অভিজ্ঞতা, উন্নতি এবং পরিবর্তন অসম্ভব।

গোটা পাঁচটি বছর ধরে সে আদালতের নিম্নতম কর্মচারী হিসেব কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে কোন উন্নতির আশা সে মোটেই করে নি। পাঁচ বছরে সম্ভবত এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা যে, দারাইব গলি চিরদিনই কর্দমাক্ত, নোংরা এবং ঘিনঘিনে মাছিতে পূর্ণ যে রকম সে হোসনিয়ার সাথে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অপরাধীর মতো নিশ্চুপে মেলামেশা করে। তার বাড়ী নেই, ঘর নেই এবং সে নিঃসন্তান অবস্থায় দিন দিন কেবল অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে।

হোসনিয়া তখনও তাকে চুমো দিতে ক্রমশঃ এগোচ্ছে।

মাহমুদ নির্নিমিখভাবে চেয়ে দেখলো হোসনিয়ার পরিশ্রান্ত অবস্থা, উদাস চোখ এবং একটা কামনা যা তার সারা দেহে রূপের লাবণ্যে উন্নত হয়ে ফুটে উঠেছে। দারাইব গলির সেই উঠোনের পিঁপড়ের ঢিবিতে গরমজল ঢালার কথা স্মরণ করে সে হোসনিয়াকে টান দিয়ে নিজের কাছে এনে খুব তাড়াতাড়ি তার কপালের নরমে চুমো দিয়ে ছুটে পালাল।

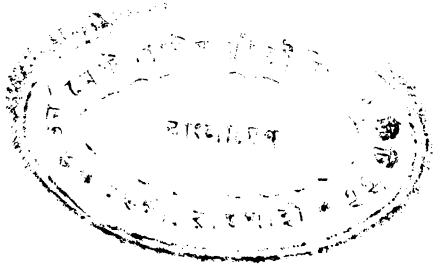

ইউসুফ ইদ্‌রীস

দায়িত্ব

এক

কায়রো।

নামটা মনে হলেই শাবরাবী কেমন একটা পুলক অনুভব করে। এমন কী নিজেকে জীবিত বলেই তার ধারণা হয় না। তখন সমস্ত অভিলাষ এক কথায় কেন্দ্রীভূত হয়—'আল্লার ইচ্ছায় সম্ভব।'

শাবরাবী ভাবে একবার মাত্র সুযোগ আর কিছু টাকা-পয়সা হলেই হলো। ব্যস্, তার সেই আগের চাকরির কর্মস্থল কায়রোর একটি দিন·····কত আনন্দের। ·····মনে পড়ে আল-কোরায়সী কিংবা আল-আহালী সিনেমা হাউস। সেই সঙ্গে তার গামানের আল্-আহমদ। তখন একটি ঘণ্টা সময় যেন জীবনের চরম আনন্দ দিতে পারতো। সত্যি কথা বলতে কী, সে বার বার আওড়াচ্ছে, 'কায়রোর একটি মাত্র ঘণ্টার জন্যে আমি আমার গোটা জীবনটাই বিলিয়ে দিতে পারি।'

তার জীবনটা বিলিয়ে দিতে হয়নি। সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে এবং একাকী আসে।

একদিন সে থানায় বসে আছে। এমন সময় একদল লোক গোলমাল করতে করতে সেইখানে উপস্থিত হলো। তাদের চীৎকার এবং গণ্ডগোল থানা জাম করে ফেললো। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নেই ঘটনার পরিসমাপ্তি। একটা আসল রূপ পাওয়া গেল। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী মিলে যাকে সেখানে হাজির করেছে সে এক দরিদ্র পাগলী।

শাবরাবীর অন্তরটা ততক্ষণে আনন্দে নেচে উঠেছে। তার ধারণা নিশ্চয়ই তারা পাগলীটাকে কায়রোর হাসপাতালে এই অবস্থায় একা পাঠাবে না। একজন চালকের প্রয়োজন। মনে মনে ভাবলো তার মত চালক আর কে আছে? কাজেই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। একটি কথাও বললো না। ঘটনাক্রমে ঘটলোও তাই।

থানার দারোগা এই দায়িত্বের ভার শেষ পর্যন্ত তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন।

শাবরাবী তখনই বাসের চালক আনতারকে ডেকে আদেশ করলো, 'তুমি শীগ্‌গীর আমার বাসায় যাও। বেগম সাহেবাকে বলে রুমালে বেঁধে আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আস। আর বালিশের ঢাকনার ভিতরে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও যেন তিনি লুকিয়ে দেন। একথাটি বলতেও ভুল করো না।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে সব প্রস্তুত হয়ে গেলো। শহরের ডাক্তারের রিপোর্ট এবং যাতায়াতের টিকিট তখন তার পকেটে। সে ভালো করে সব একবার দেখে নিল। শাবরাবীর ভাবতে আশ্চর্য লাগে এসব সত্যি কি না। আর মাত্র ট্রেনে পা রাখা, তার পরই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কায়রো। তখন সেই সদর রাস্তায় ভ্রমণ, বাসে চড়ে ঘোরাফেরা, পুরানো বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ, বকরীর মাংস ভুনা, এমন কী মোয়াল্লীম আলু-হানাফীর সুস্বাদু কাবাব—সমস্ত মিলিয়ে একটা বাস্তব চিত্র তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শাবরাবী ভয়ে ভয়ে স্টেশনে পৌঁছলো, তাকে এগিয়ে দেবার জন্য। সবার মুখেই এক কথা, 'জুবাইদার যত্ন নিও।'

জুবাইদার পিতা নিশ্চুপে শাবরাবীর পকেটে একটা মোহর গুজে দিল জুবাইদার স্বামী দিল অর্ধ-মোহর। শাবরাবী স্পষ্ট এবং লম্বা হাসিতে তাদের কথায় সায় দিয়ে মাথাটা নিচু করলো।

বিরাট কাফেলা। সবারই দৃষ্টি সেইদিকে। বাইরের লোক দু'একজন যারা শাবরাবীকে চিনতো, জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

: এই ওখানে।.... শাবরাবী সংক্ষেপে উত্তর দিল।

: ওখানে কোন্‌খানে? প্রশ্নকর্তারা হাসলো।

: ওহ্, এই কায়রো। শাবরাবী বেশ গম্ভীর।

আনন্দের শুয়ো-পোকা শাবরাবীর অন্তরে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ডেল্টা মেইল স্টেশনে ভিড়লো।

দু'জন গাড়ীতে উঠে পড়লো।

জুবাইদা শান্ত নীরব হয়ে ট্রেনের এক কোনায় বসে।

ট্রেনটা আল্লার তত্ত্বাবধানে চলছে।

তৃতীয়বার শাবরাবী তার পকেটের কাগজ-পত্র সব পরীক্ষা করে দেখলো ঠিক আছে কি না। ঠিক হ্যাঁ,। এখন সব মাখনের মত সুষ্ঠুভাবে চলছে। এইবার সে তার কোমরের বেল্টটা খুলে উপরে ঝুলিয়ে রাখলো। জুবাইদার কথা তখন একরূপ তার মনেই নেই।

ইতিমধ্যে ডেল্টা মেইল অনেকগুলো ছোট ছোট স্টেশন অতিক্রম করেছে। এখন আল্-মনসুরাতে এসে পৌঁছলো। দেখতে ঠিক লম্বা অজগরের মত।

দু'জন নেমে পড়লো। উঁচু ওভার ব্রিজটা পার হতে গিয়ে শাবরাবী জুবাইদার হাত ধরে সন্তর্পণে হাঁটছে আর উচ্চারণ করছে, 'তাপসী জয়নব, তোমার আশীর্বাদ চাই।'

এবার কায়রোর ট্রেন ধরতে হবে। চেয়ে দেখে ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আবার দুজন উঠে পড়লো। জুবাইদাকে বসিয়ে দিল একটা জানালার ধারে।

বাইরে তখন ফেরিওয়ালাদের চীৎকার, শরবত চাই ? শরবত।...

শাবরাবী ফেরিওয়ালা ডেকে এনে এক চুমুকে দু'গ্লাস শরবত কাবার করলো। তৃতীয় গ্লাস জুবাইদার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। রাগে তার চোখ দুটো অসম্ভব জ্বলছে। শাবরাবী পিঠে হাত বুলিয়ে বললো, 'নাও না একগ্লাস শরবত!'

ঃ 'না খাবো না।' জুবাইদা আবার হাত দিয়ে ধাক্কা দিল।

শরবত সহ গ্লাসটা ফিরিয়ে নিল শাবরাবী।

ট্রেন চলছে। জুবাইদা অবোধ শিশুর মত জানালা ধরে বাইরে তাকিয়ে আছে। মুখটা শুকনো। শুকনো মুখে বিকৃত হাসি।

ট্রেনটা সান বাল্লায়ান পৌঁছার আগেই জুবাইদা লাফ দিয়ে উঠলো। দু'হাতে বুকটা অসম্ভব চেপে ধরে অভিযুক্ত আসামীর মতো ভোরের আকাশে গর্জন তুললো, 'ইয়া লাহাবী...কী সর্বনাশ।...'

শাবরাবী বিমূঢ়। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি হয়েছে জুবাইদা...তোমার কি হয়েছে?'

জুবাইদা নিরুত্তর। হাত দুটো থুতনীর নীচে রাখলো। তারপর সমস্ত শক্তি খাটিয়ে চোখ অসম্ভব বড় করে একখণ্ড থুথু দূরে নিক্ষেপ করলো। উত্তেজিতা রমণীরা সচরাচর যে রকম করে থাকে।

গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীদের দৃষ্টি তখন সেইদিকে।

শাবরাবী লজ্জায় জমে গেছে। সামান্য হাসি ছড়িয়ে সে সব কিছু হজম করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু চোয়াল-ভাঙ্গা মুখ তা থেকে মোটেই রেহাই দিল না। সে জুবাইদাকে আদর করে বললো, 'রাগ করো না লক্ষ্মী বোনটি আমার! ধৈর্য ধরো। রাগ করে লাভ নেই, লক্ষ্মী বোন।'

জুবাইদা শান্ত হলো।

শান্ত হলোনা যাত্রীরা। তাদের জিহ্বা নড়ছেই। প্রথমত ফিস্ ফিস্, তারপর উচ্চ স্বরেই বলাবলি শুরু করলো। পাশের একজন মহিলা আর একজনকে বললো, 'এ নিশ্চয়ই ওর স্ত্রী। হতভাগা।....'

উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে কামরার অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনি উঠলো। দুটো ছেলে সিট থেকে মাথা উঁচু করে চেয়ে দেখলো ব্যাপারটি।

শাবরাবী পরিস্থিতি বদলাবার জন্যে তার রুমালটার গিরু খুলে নাস্তা করবার চেষ্টা করলো। আবার কি ভেবে বন্ধ করে দিলো।

একজন লোক অত্যধিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মহিলাটির কি হয়েছে জমাদার সাহেব?'

শাবরাবী খুব সংযত। আস্তেকরে বললো, 'অ্যাঁ, না, না, কিছু না ··সে···' তারপর হাতের আঙ্গুলগুলো নিজের মাথার উপর এনে বুঝিয়ে দিয়ে বললো, 'হেড-অফিসে গোলমাল।'

লোকটা বুঝতে পেরে তার শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শুধু উচ্চারণ করলো, 'ইন্না লিল্লাহ···আক্ষেপ।....'

জুবাইদা সেদিকে চাইতেই শাবরাবীর হাতের আঙ্গুল নাড়া বন্ধ হয়ে গেল। সে রেগে বললো, 'কিছু বুঝি না, না? তুমি কি জানো শয়তান?'

শাবরাবী অবাক।

চেয়ে দেখে জুবাইদা মুখটা অসম্ভব নেড়ে নেড়ে তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সে আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল এবং মাথাটা দেয়ালে না ঠেকা পর্যন্ত থামলো না। কেবলি শাবরাবী রুমালটা উঁচু করতে যাচ্ছে এমন সময় জুবাইদা লাফ দিয়ে কামরার ছাদের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। অবশেষে যত জোরে পারলো চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'আমাদের গ্রামের সেই 'পাশা' মরুক। প্রধান মহম্মদ বী, তুমি বেঁচে থাকো! তোমরা ধন্য।'

এক দলা থুথু ফেলে জুবাইদা আবার নীরব।

ট্রেন হঠাৎ থেমে গেল। যে সব যাত্রীরা ঝিমুচ্ছিল তাঁদের চোখে ঘুমের মাদকতা। ওপাশের লোকটি বেঞ্চির নীচ থেকে তার বাক্সটা টেনে বের করে নেমে পড়লো। গাড়ীর যাত্রী একরূপ অর্ধেক হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক যাত্রী অবাক হয়ে চেয়ে আছে ঘটনার শেষ পরিণতি দেখবার জন্যে।

শাবরাবীর বুক পকেট ততক্ষণে ঘামে ভিজে গেছে। সে জোর করে জুবাদাইকে সিটে বসাতে চাইলো কিন্তু পারলো না। জুবাইদা শাবরাবীর হাতটায় কামড়ে দিয়ে সরে পড়লো। আবার সেই চীৎকার জুড়ে দিল, 'আমাদের গ্রামের সেই 'পাশা' মরুক। প্রধান মোহাম্মদ বী বেঁচে থাকো। তোমরা ধন্য।'

এক দলা থুথু ফেলে জুবাইদা আবার নীরব।

ফেরিওয়ালারা চোখ টিপে হাসছে। যাত্রীরাও সেই হাসিতে যোগ দিল।

শাবরাবীও এবার না হেসে পারলো না। হঠাৎ শাবরাবীর চক্ষু স্থির। চেয়ে দেখে জুবাইদা তার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। এমন কী নাভির নীচের অংশে পর্যন্ত কোন আবরণ নেই।

শাবরাবী তাকে নিষেধ করতে যাচ্ছে এমন সময় সে তাকে ঘুষি মেরে চীৎকার জুড়ে দিল, 'আমাদের গ্রামের সেই 'পাশা' মরুক··· ।

দু'জনে ভীষণ ধস্তাধস্তি। অবশেষে শাবরাবী তাকে একটা চাদর দিয়ে বেঁধে ফেলে সিটে বসিয়ে দিলো।

চাদরটা দিয়েছিল পাশের একজন ভদ্রলোক।

শাবরাবী জয়ী হলো ঠিক কিন্তু এই জয় যেন তাকে ক্রমশ পাগল করে ফেললো। এতক্ষণ সে খেয়ালই করে নি। হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে দেখে যে তার মাথার মূল্যবান লাল পাগড়ীটা জুবাইদা বাইরে ফেলে দিয়েছে। এখন টেকো মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

বাঁধা অবস্থায়ও জুবাইদা চীৎকার করছে, 'আমাদের গ্রামের সেই পাশা মরুক।'

এক দলা থুথু ফেলে সে আবার নীরব।

ট্রেন বাল্‌বেসে পৌঁছলে জুবাইদাকে খুব শান্ত মনে হলো।

যাত্রীরা যার যার জায়গায় ফিরে গেছে কিন্তু শাবরাবী জুবাইদাকে জান্‌লার কাছে একা ফেলে সরতে পারলো না। কায়রো স্টেশনে পৌঁছলে শাবরাবীকে ক্ষিপ্ত মনে হলো। দীর্ঘ ট্রেন জার্নির অস্বস্তিকর পরিবেশ তার একমাত্র কারণ। সমস্ত যাত্রীরা নেমে না-যাওয়া পর্যন্ত তারা দু'জন অপেক্ষা করলো।

শাবরাবী জুবাইদার বাঁ হাত খুব নির্দয়ভাবে জোর করে ধরে গাড়ী থেকে নামলো . নির্দয়ভাবে ধরার কোন প্রয়োজন ছিল না যেহেতু জুবাইদা তখন সিল্কের মত নরম হয়ে শাবরাবীর সাথে সাথে হাঁটছিল

॥ দুই ॥

এই সেই কায়রো।

এখানে শাবরাবীর কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু ঘটনার চাপে পুরোনো ইচ্ছার কোন সদ্ব্যবহারই সে করতে পারলো না।

দু'জনে তাড়াতাড়ি একটা বাসে চাপলো। জুবাইদা এখন অন্য দশজনের মতো। এবার তারা আতাবায় নেমে পড়লো এবং আল্-আজহারের দিকে সোজা পথ ধরলো।

আল্-আজহারে পৌঁছে শাবরাবী একটা সুন্দর পাগড়ী কিনলো। পাগড়ী কিনলো বটে কিন্তু এটা তার মাথায় আস্ত পাথরের মত ভারী বোধ হতে লাগলো। তখন সে জুবাইদার বাবা ও স্বামীর কাছ থেকে নিশ্চুপে যে মোহর এনেছিল সেই কথা মনে করে তাদেরকে গালাগালি দিয়ে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলো।

এখন শাবরাবীর একমাত্র বাসনা কী করে জুবাইদাকে এড়ানো যায়। এ দায়িত্বের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে পারলে সে নিজেকে কায়রো উপভোগ করতে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করতে পারে।

বাসের জন্য তারা দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বাসটিও যাত্রীতে ভর্তি। পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এই সমস্যা শাবরাবীকে হতবুদ্ধি করে ফেললো। সামান্য পরে সে জুবাইদার দিকে একটু এগোলো। কেননা জুবাইদা পাশের অন্য একজন লোকের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল।

ভদ্রলোক পত্রিকা পড়বে ভাণ করে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। ভিতরে ভিতরে একটু স্পর্শের ইচ্ছে। শাবরাবী জুবাইদাকে খোঁচা মেরে একটু

সরিয়ে আনতেই চীৎকার জুড়ে দিল, 'আমাদের গ্রামের সেই পাশা মরুক।...'

এক দলা থুথু ফেলে জুবাইদা আবার নীরব।

বাস মিললো। কিন্তু মাঝ পথে গিয়ে জুবাইদা আবার সেই চীৎকার জুড়ে দিল।

বাসের ড্রাইভার বাস থামিয়ে তাদেরকে জোর করে ধাক্কিয়ে নামিয়ে দিল। সর্বসাধারণের বাসে এইরূপ একজন বদ্ধ পাগলী নিয়ে আসায় শাবরাবীকে দোষারূপও করলো সে।

দু'জন পায়ে হেঁটে সরকারী প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু জুবাইদা কোনক্রমেই চীৎকার থামাচ্ছে না। সমস্ত মোহাম্মদ আলী রোডে লোক ধরে না। জনতা যতই বাড়ছে জুবাইদার চীৎকার আরও উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে পৌঁছছে।

শাবরাবী প্রায় অর্ধ-মূর্ছিত। লজ্জায় মুখ তুলে চাইতে পারছে না।

চীৎকারের মধ্যেই শাবরাবী গেটের দারোয়ানকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'ডাক্তার সাহেব আছেন?'

'এখন ছ'টা বাজে। এই সময়ে সরকারী অফিসে কোন লোক থাকে না।' দারোয়ান সহানুভূতি মিশিয়ে বললো।

: তা'হলে আমরা কি করবো?

: আগামী কাল আসবেন।

: আগামী কাল? কি বলো তুমি?

: হ্যাঁ, আগামী কাল সকাল আটটায়।

দারোয়ান জনতা তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে গর্জন করে উঠলো। লোকজন সব সরে গেলো কিন্তু সরে পড়ার আগে ফিস্ ফিস্ করে কী সব মন্তব্য করলো।

শাবরাবী কতক্ষণ বিমূঢ় দাঁড়িয়ে রইলো। উপায়ান্তর না দেখে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আজকের রাতটা এখানে থাকতে দিতে পারো?'

দারোয়ান কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শাবরাবীর আর বুঝতে বাকী রইলো না। দু'জনে পথ ধরলো।

পথে নেমে শাবরাবী কেবলি ভাবছে সে কী করে এই রাত কাটাবে, যতক্ষণ এই বিপদ তার সাথে সাথে আছে। প্রথমত তার বিশ্রাম দরকার। সে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত। তাছাড়া গত এক দিন ধরে তার পেটে একটা দানাও পড়ে নি।

বাব-আল্-খাল্ক রেস্তোরাঁ। এখানে এসে দু'জন বসে পড়লো। শাবরাবী কাঁধটা রাখলো জুবাইদার গা ঘেষে। রেস্তোরাঁর মালিক যা ইচ্ছে ভাবুক গে। সে দিকে তার খেয়াল নেই। বয়কে ডেকে হুকুম দিলো, 'কিছু নাস্তা ও চা নিয়ে এসো। পরে একটা সিগারেট দেবে। বুঝলে?'

এতক্ষণে শাবরাবী একটু পরিতৃপ্ত। সামান্য নাস্তায়ই যেন তাকে খুব আরাম দিল। সে বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময় ওপাশ থেকে কি একটা ষড়যন্ত্রের কথা কানে এলো। কে যেন বললো, 'বোধ হয় বেশী দূর থেকে আসেনি এরা কিন্তু এখানে, এই ভাবে?'

ওখানে বসে থাকা শাবরাবীর দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। সরে পড়া ভালো। তার আগে মুখটা গম্ভীর করে শাবরাবী উত্তর দিলো, 'কে বললো বেশী দূর থেকে আসি নি!'

এবার শাবরাবী পাশের লোকটির দিকে তাকালো। লোকটি দেশী জামার উপর ওভারকোট চাপিয়েছে। শাবরাবী বুঝতে পারলো সে সরকারী লোক। সুতরাং তার কাছে এই ঘটনার বিসমিল্লাহ্

থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করতে ছাড়লো না। অবশেষে বললো, 'আমি লোকগুলোকে একটু দেখতে চাই। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত দয়া করে যদি ওকে একটু দেখেন তো যেতে পারি।'

: 'আচ্ছা আপনি যান।' লোকটি মাথা নেড়ে বললো।

শাবরাবী গুলির মত চলে গেলো।

একটু পরে সে ফিরে এসে দেখে জুবাইদা সমস্ত রেস্তোরাঁটাকে এক বদমাইশের আড্ডায় পরিণত করেছে। জুবাইদাকে হ্যাচকা টান দিয়ে কাছে এনে লোকটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে শাবরাবী বললো, 'কিছু মনে করবেন না। আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম।'

দু'জনে আবার পথ ধরলো। কিন্তু কোথায় যাবে?

সূর্য ডুবেছে বেশ অনেকক্ষণ আগে। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো শাবরাবীর চোখ ঝলসে দিলো। আলো দেখে তার অতীতের সুখময় দিনগুলোর কথা মনে পড়লো। এখন সে অন্য জগতে জুবাইদা আবার চীৎকার জুড়ে দিলো, 'আমাদের গ্রামের সেই পাশা মরুক। প্রধান মোহাম্মদ বী, তোমাদেরকে ধন্যবাদ। তোমরা বেঁচে থাকো।...' আর গলা টেনে টেনে থুথু ফেলছে জুবাইদা।

শাবরাবী ভাবলো এখন তার কাছে ছোরা থাকলে সে নির্ঘাত তাকে খুন করে ফেলতো। এতে হয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সম্ভাবনা। তা হোক্ গে। এসব চিন্তা সে আগে করেনি কেন? এবার সে স্থির করলো একটি থানাই তাদের রাত্রি কাটানোর জন্যে যথেষ্ট।

বাসে চাপলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা দুইজন সায়য়ীদা এলাকার এক থানায় এসে পৌঁছলো। থানার সম্মুখে একজন সেন্ট্রী পাহারায় রত।

শাবরাবী তার কাছে সব ঘটনা খুলে বলে শেষে শুধু অনুরোধ করলো, 'অন্তত ওকে রাখবার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

ঃ এটা একটা মস্তবড় দায়িত্ব, জনাব। আপনিত তা' ভাল করেই জানেন।' সেন্ট্রি মাথা নেড়ে বললো।

ঃ তবে আমাদের দু'জনকেই আপনাদের হেফাজতে রাখুন।

ঃ এটা আরও দায়িত্বপূর্ণ, জনাব।

থানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় শাবরাবী পৃথিবীর সমস্ত দায়িত্বের উপর অভিসম্পাত করলো। সব চেয়ে বেশী রাগ হলো তার নিজের দায়িত্বের উপর। যেটাকে সে কোন ক্রমেই এড়াতে পারছে না এবং যা নাকি পানি তোলার ঘটির মতো সব সময়ের জন্যে চৌবাচ্চায় ডুবে আছে।

।। তিন ।।

জ্ঞান ফিরে এলে শাবরাবী একটা হোটেলের চিন্তা করলো। সেত অল্পক্ষণের জন্য। তারা মাত্র দু'জন। জুবাইদা মেয়ে-মানুষ, আর সে নিজে একজন পুরুষ। হোটেলে একটা স্বতন্ত্র কামরার দরকার। কিন্তু এক রাত্রিতেই ভাড়া হবে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকার মতো। এত টাকা সে পাবে কোথায়? হোটেলের চিন্তা আপাতত বাদ দিয়ে শাবরাবী উচ্চারণ করলো, 'সুবহান আল্লাহ্।'

শাবরাবী খুব পরিশ্রান্ত। এক পা এগোতে পারবে না ভেবে থানার কাছাকাছি একটা মসজিদের সম্মুখে সে বসে পড়লো। পাশে জুবাইদা। কেবল লজ্জায় সে কাঁদতে পারছে না। এখন সে নিশ্চিত যে, তার মত হতভাগ্য আর দ্বিতীয়টি নেই।

ইতিমধ্যে অজস্র মোল্লা-মৌলবী পিঁপড়ের ঝাঁকের মত মসজিদ প্রাঙ্গণে আসতে লাগলেন। জুবাইদা তখন আবার সেই চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, 'আমাদের গ্রামের সেই পাশা মরুক। ...'

কিন্তু আশ্চর্য একজন মোল্লা-মৌলবীও এতে বিরক্ত হলেন না। বরঞ্চ তাঁরা কোরান শরীফের সুরা 'ইয়াসিন' থেকে কিছুটা অংশ টেনে পানিতে ফুঁ দিয়ে জুবাইদার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন।

শাবরাবী অবাক। মুহূর্তের মধ্যে তার মনে পরিবর্তন দেখা দিল। এখন তার নিজেকে অপ্রস্তুত এবং ফাল্‌তু বলে মনে হয়। জুবাইদা যাই করছে কিছুই যেন আর শাবরাবীর কাছে খারাপ ঠেকছে না। সে এখন অন্য মানুষ। জুবাইদাকে ঘিরে তার যত রাগ সব যেন ক্রমশ কমে আসতে লাগলো।

সে পাশ ফিরে চেয়ে দেখলো একজন শায়েখ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। বাহু দুটি বাঁকা করে মাথার নীচে রেখে তিনি পথিকদের যাতায়াত লক্ষ্য করছেন। তাঁর মুখে তৃপ্তির আভা। পবিত্রতার স্পর্শ চোখে চোখ পড়তেই শায়েখ সাহেব তাকে ডেকে বললেন, 'বল আল্লাহু এক।'

: 'নিশ্চয়, আল্লাহু এক।' খুব জোরে শাবরাবী স্বীকার করলো। শায়েখ সাহেব ভক্তিতে মাথা নত করলেন।

ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় পথিকরা চুরুটের শেষ অংশ শায়েখ সাহেবের সামনে ছুঁড়ে দেয়। তিনি তা কুড়িয়ে নেন, জোরে টানেন। অবশেষে এক গাদা ধোঁয়ো ছাড়েন। আর সেই ধুঁয়োর ভিতরে মুখ রেখে শাবরাবীকে বলেন, 'আবার বল আল্লাহ্ এক।'

শাবরাবী এবার নিজেকে চেপে রাখতে পারলো না। হেসে ফেললো।

সে ভাবলো সে যদি শায়েখ সাহেবের মত নিশ্চিন্ত থাকতে পারতো! কেন তার উপর এই দায়িত্ব চাপানো হলো! দায়িত্বের কথা মনে পড়তেই সে জুবাইদাকে দেখবার জন্যে মুখ ঘুরালো। সহসা আনন্দে তার মনটা নেচে উঠলো। কেননা জুবাইদা ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই প্রথম শাবরাবী ইচ্ছে করেই জুবাইদার মুখের দিকে তাকালো। তার চেহারায় খুব আকর্ষণীয় তেমন কিছু ছিল না তথাপি গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল ফর্সা এবং সুডোল মুখের গঠন। সমস্ত শরীরে তার ক্ষতের চিহ্ন ইতস্তত ছাড়িয়ে আছে এবং পা দুটো কাদায় লেপটানো, তদুপরি খাড়ু পরিহিতা। যখন সে ঘুমুচ্ছিল, অন্য দশজন থেকে তাকে চিনতে ভুল হলো না। শাবরাবী চেয়ে দেখলো তার কাপড় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তাছাড়া উরু পর্যন্ত আলগা হয়ে আছে। সে চোখ বুজে জুবাইদার কাপড়টা টেনে নীচের অংশ ঢেকে দিল।

রাত বাড়ছে। চারদিক নীরব।

শায়েখ-বাবার শিষ্যরা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। সারাদিন সার্কাস দেখিয়ে বানরগুলো যেরূপ পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

শাবরাবীকে সারারাত জেগে থাকতে হবে। এটা মোটেই তার পক্ষে সহজ নয়। লম্বা জার্নির ক্লান্তিতে সে খুব পরিশ্রান্ত। তাছাড়া এই দুশ্চিন্তা ও দায়িত্বের বোঝা তার সমস্ত শক্তি তিলে তিলে ক্ষয় করে দিয়েছে। কাজেই রাত্রিটাকে তার কাছে মনে হলো কাটা বিছানো লম্বা রাস্তা। কোন রকমেই ফুরাতে চায় না।

সকাল সাতটা। আবার দু'জন সরকারী হাসপাতালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। মাছির ঝাঁকের মত অজস্র লোক জুবাইদার দৃশ্য দেখবার জন্যে সেই খানে হাজির হলো।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ডাক্তার এলেন। তিনি শাবরাবীর হাত থেকে দরকারী কাগজ-পত্র চেয়ে নিয়ে তার উপর নজর বুলিয়ে বললেন, 'ওকে কাসর আল-আইনী হাসপাতালে নিয়ে যাও। সেখানে পর্যবেক্ষণ কক্ষে রাখতে হবে।'

: জ্বী আচ্ছা', শাবরাবী খুব বিনীতভাবে বললো।

দু'তিনটে বাস বদলিয়ে তারা কাসর আল-আইনী হাসপাতালে পৌঁছলো। ডাক্তার এসে কেবলি জুবাইদার রোগের কারণ জিজ্ঞেস করতে যাবেন অমনি সে চীৎকার জুড়ে দিল, 'আমাদের গ্রামের সেই পাশা মরুক। প্রধান মোহাম্মদ বী বেঁচে থাকো। তোমরা ধন্য।'

এক দলা থুথু ফেলে জুবাইদা নীরব।

ডাক্তার হাসলেন। খতিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বললেন, 'পর্যবেক্ষণ কক্ষে কোন সিট খালি নেই।'

এই কথাটি তিনি কাগজের উপর লিখেও দিলেন।

: 'এখন আমরা কি করবো ডাক্তার সাহেব?' খুব অনুনয় করে শাবরাবী বললো।

: আবার সেই সরকারী মহলে ফিরে যাও।

: আবার?

: হ্যা, আবার।

নিরাশ হয়ে দু'জন ফিরে চললো। জুবাইদা এমন কী সমস্ত ডাক্তারকে হত্যা করবার ইচ্ছে জাগলো শাবরাবীর। সে এখন জুবাইদার মত পাগল। মুহূর্তের মধ্যে আবার তার মনের গতি বদলালো, 'অস্থির হলে চলবে না।'

সরকারী মহলের সামনে আবার দু'জন দাঁড়িয়ে আছে।

যথাসময়ে ডাক্তার এলেন। তিনি শাবরাবীর হাত থেকে কাগজ-গুলো চেয়ে নিয়ে অন্যান্য ডাক্তারদের সব রিপোর্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়লেন। তারপর শাবরাবীকে অবাক করে দিলেন এই বলে, 'কায়রোতে তার কোন আত্মীয়-স্বজন এসেছে? হাসপাতালের ফরম পূর্ণ করতে আত্মীয়ের দরকার হয়।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ডাক্তার সাহেব আবার যোগ দিলেন, 'না'হলে যেখান থেকে এসেছো আবার সেইখানে ফিরে যেতে হবে।'

: 'আবার সেই আল্-দাখালিয়াতে যেতে হবে?' শাবরাবী বিমূঢ়।

: নিশ্চয়!

: কিন্তু এটা অসম্ভব ডাক্তার সাহেব। ফেরত যেতে মাত্র একজনের টিকিট আছে। কেবল আমার।

: কিন্তু তার একজন আত্মীয়ের দরকার।

: দয়া করুন ডাক্তার সাহেব। বড় অনুরোধ করি।

: অনুরোধের কথা নয়। এটা একটা দায়িত্ব। এসব আমাদের ঘাড়ে নেবার কথা নয়

'দায়িত্ব' কথাটা শুনেই শাবরাবী চমকে উঠলো। অসম্ভব দুশ্চিন্তা তাকে মূর্ছিত করবার আগেই কথোপকথনের মাঝখানে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো জুবাইদা ততক্ষণে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সেই খানে পায়চারী শুরু করে দিয়েছে

উপস্থিত সকলেই হতভম্ব পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলে যেমনটি হয়

শাবরাবী সমস্ত কৌশল খাটিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু বিফল শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পুলিশের সাহায্যে তাকে

কোণ ঠাসা করলো। আবার শাবরাবী ও জুবাইদার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। জুবাইদার অশ্রান্ত চীৎকার, 'আমাদের গ্রামের সেই পাশা মরুক। প্রধান মোহাম্মদ বী দীর্ঘজীবী হও।'

শাবরাবী হাতটা বাড়াতেই অসম্ভব জোরে কামড়ে দিল সে। রাগে টিকতে না পেরে শাবরাবী একটা ঘুষি বসিয়ে দিল জুবাইদার মুখে। মুখ ফেটে তখন রক্তের স্রোত বইছে।

ডাক্তারের কক্ষে ফিরে আসলে তিনি একটি জ্যাকেট দিলেন। চারজন লাগলো জুবাইদাকে সেই জ্যাকেট পরাতে। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সে মেঝে গড়াতে লাগলো। সারা মেঝে তখন তাজা রক্তে রঞ্জিত

ডাক্তার এইবার তাড়াতাড়ি ফরম পূর্ণ করলেন। শাবরাবী ভয়ে কাঁপছে। বুঝতে পারলো সে কী অন্যায়টাই না করেছে। এখন তার জ্ঞান হলো যে জুবাইদা সত্যিই পাগল। শাবরাবীর এই কষ্টের জন্যে সে মোটেই দায়ী নয়।

একটা অব্যক্ত বেদনা শাবরাবীকে ছেয়ে ফেললো। সে কেবলি আফসোস করছে আহা বেচারী তখন পর্যন্ত কিছুই খায় নি। এমন কী পানি পর্যন্ত স্পর্শ করে নি। সেই মুহূর্তে সে দেখতে পেলো জুবাইদা বুকটা দু'হাতে চেপে ধরে মেঝে মাথা ঠুকে এদিক ওদিক গড়াচ্ছে। শাবরাবী টিকতে পারে না। মুখ থেকে শব্দ হলো, 'উহ্...।'

: 'এইবার সব শেষ।' ডাক্তার ঘোষণা করলেন।

শাবরাবীর দায়িত্বের বোঝা এখন থেকে শেষ।

এ্যামবুলান্স আসলো। জুবাইদাকে এ্যামবুলান্সে তুলে দেওয়া হলো। তখনও তার মুখে সেই কথা, 'পাশা মরুক। প্রধান মোহাম্মদ বী তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

গাড়ী শুদ্ধ সবারই বিকট হাসি।

হাসতে পারে না কেবল শাবরাবী।

সে পাগলের মত চার পাশে কেবল পায়চারী করতে লাগলো। তারপর ড্রাইভারকে কয়েক মিনিটের জন্য গাড়ীটা থামাতে বলে সে বাইরে চলে গেল।

শাবরাবীর হাতে একখণ্ড পাতলা রুটি ও কিছু সুস্বাদু হালুয়া। সে রুটি ও হালুয়া পুলিশদের হাতে তুলে দিয়ে যতটা সম্ভব বিনয় সহকারে বললো, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শপথ তোমরা ওর যত্ন নিও। ওকে দয়া দেখিও। তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের কথা স্মরণ করে ওর প্রতি সুদৃষ্টি রেখো। খোদা হাফেজ!'

গাড়ী ছাড়লো।

কোথাও না দাঁড়িয়ে শাবরাবী সোজা রেল-স্টেশনে পালিয়ে এলো। তার আত্মা কায়রো এমন কী গোটা পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ। সে বার বার তার হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। জুবাইদার কামড়ের দাগ। কী স্পষ্ট। শাবরাবীর সমস্ত শরীরে লজ্জার একটা অসম্ভব ঝাঁকুনি যা ইতিপূর্বে সে কখনো অনুভব করে নি।

ইদরীস শা'রাবী

তীর্থযাত্রা

আমি তো অবাক !

বাসের ড্রাইভার কাসাব্লাংকা থেকে ফেজ যাওয়ার পথে বললো যে তার নাম জুলিয়াস সীজার। তা ছাড়া সে নিজের ব্যাখ্যাও করলো, 'কেন তা হবে না বলুন ? যেহেতু আমি একজন আরবের লোক কাজেই আমার নাম কি হবে সেই পুরোনো ধরনের আলী-বিন অমুক ?'

আমি হাসলাম।

'দেখুন, এই দিকে তাকান।' বলে সে তার পরিচয়-পত্র আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো।

সত্য কথা শেষের নাম সীজার। প্রথম নাম জুলিয়াস। যেন মোহাম্মদ এর পুত্র মোহাম্মদ। জন্ম : আনুমানিক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রাম : আল আগলাগল। মরক্কোর উপজাতি। পেশা : গাড়ীর চালক। নাগরিত্ব : আমেরিকার বাসিন্দা।

'কি করে এ চাকরি তুমি যোগাড় করলে ?' হেসে বললাম।

'একজন জমিদারের সহায়তায়। তিনি আমার খুব দরকার বোধ করছিলেন। মরক্কো হলো রহস্য-পূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর জায়গা।

তাঁর একটা গোপনীয় কাজ দেখাশুনার ভার ছিল আমার উপর। বলে গাড়ীটায় হেলান দিয়ে সেও হাসলো।

আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

'আর আপনি? আপনার নামটা জানতে পারি কি?' সে প্রশ্ন করলো।

'ইদরীস ফারদী।' ছোট্ট করে জবাব দলাম।

'হাজী ফাতমীর পুত্র?' সে আবার বললো।

'হাজী ফাতেমী ফারদীর পুত্র।' আমি উত্তর দিলাম।

'হতভাগ্য!' বলে সে জানালার মরুপথে একদলা থুথু ফেলে আমার মার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলো।

আমার মা ছিলেন বোরখাআবৃতা। কেবল দুটো চোখ এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ছাড়া তাঁর আর কিছুই দেখবার উপায় ছিলো না। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কে? বোন, স্ত্রী, না নানী?

'আমার মা।' সংক্ষেপে বললাম।

সে আবার বললো, 'হতভাগ্য!' তারপর এক জোড়া 'সালু' দম্পতির দিকে এগিয়ে গিয়ে তা'দের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সাহস দিলো।

তারা দু'জন উঠে এক ঝলক হেসে উপরের সিটে গিয়ে বসলো।

ততক্ষণে আমি ও মা তা'দের সিট দখল করলাম।

জুলিয়াস পা-বাঁধা কতকগুলো মোরগ-মুরগী একহাতে তুলে নিয়ে ড্রাইভিং সিটের কাছে খালি জায়গায় সতর্কভাবে রাখলো। এবার যাত্রীদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে বললোঃ শুনুন, সম্ভবতঃ আপনাদের ভেতর নানা ধরনের লোক আছেন। কেউ

ভীরু, গর্ভবতী, হৃদ্‌রোগগ্রস্ত অথবা পেটের অসুখে ভুগছেন। তাঁদেরকে অনুরোধ করবো তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে যেতে। তাঁরা বরঞ্চ ফ্রান্সের সি-টি-এম অথবা ভ্যালেনাতে নাম লিখিয়ে দিন। আপনাদের তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত ভার তারাই নেবেন।··· ···আচ্ছা সব ঠিক আছে!'

কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নীরব।

'বেশ। শেষে কেউ যেন এই গাড়ীতে কোনরূপ চীৎকার, উৎপাত না করেন।' জুলিয়াস মাথার টুপিটা ভালো করে বসিয়ে আবার যোগ দিলো, 'আমি যাদি আগে থেকেই এ-সব দেখে শুনে না নিই, তবে বলা যায় না কখন কোন্ মুসিবত ঘটে! এসব যেন কল-কব্জার মতোই। একটা ঢিলে হলে আর রক্ষে নেই।' ষ্টেয়ারিং হুইল শক্ত করে ধরে শেষে বললো 'প্রস্তুত?'

'প্রস্তুত।' এস সঙ্গে সবারই কণ্ঠস্বর।

জুলিয়াস ঝট করে গাড়ীর জান্‌লা বন্ধ করে দিলো। গাড়ী কাঁপতে কাঁপতে অজস্র ধুঁয়া নির্গত করে সামনের দিকে চলছে।

আমার মা বোরখার ভেতর থেকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। ভয়ে তিনি সেই যে চোখ করলেন বন্ধ আর খোলবার নাম করলেন না।

জুলিয়াস চমৎকার গাড়ী চালাতে জানে। প্রথম এক শ' মাইল সে আশ্চর্যভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, একদল সন্ন্যাসীর ভীড় অতিক্রম করেছে, এমন কী খেপা কুকুরের ঝাঁকও পেরিয়ে এসেছে। সিটে বসে সে ভারী সুন্দর ভাবে চাকা ঘুরিয়েছে। মনে হয়েছে যেন তার দু'টো আঙ্গুলের মাঝখানে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা একটা সিগারেট। পড়বার ভয় নেই। মাঝে মাঝে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছেও। এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমরা

যেন ছিলাম তার পাশে এ-টা শহরের অধিবাসী সহ বিরাট ষ্টীমার-যাত্রা। অন্ততঃ তার ব্যবহারে তাই প্রকাশ পেয়েছিল। আমাদের রাস্তাটা ছিল বিপদসঙ্কুল। আর সে রাস্তা অতিক্রমের ব্যাপারটি মনে হলো উন্মত্ত জোয়ারে নৌকা চালানোর মতো।

কখনো সে গলা বাড়িয়েছে, বাঁকিয়েছে, আবার কখনও রাজ হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক শব্দও করেছে। চোখের কয়েকটা পলক মাত্র। রাস্তার প্রাসাদ, পুরানো বাড়ী সব কিছু কোথায় পড়ে রইলো। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পাশের যে যাত্রী আমার দিকে মুখ করে বসে, পত্রিকা পড়ছিল।

গাড়ী লাফিয়ে চলছে। আমার মা আমার হাতটা ধরতে চাইলেন। আস্তে করে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। অসহায় একটা চড়ুইর মতো তিনি আমার হাত ধরলেন। সামান্য সাহায্য, তার চেয়েও আমার উপস্থিতি এইটাই তাঁর বাসনা।

দারিদ্র্য, এবং চাকরবাকরের অভাবে মা সেবাযত্নও ততটা পাননি। কাজেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বাবা তাঁকে আজীবন বন্দিনী অবস্থায়ই বাড়ীতে রেখেছিলেন। কাজেই মুক্ত আলোবাতাস থেকেও তিনি দীর্ঘদিন বঞ্চিতা। বিয়ের পর সেই যে তিনি বাপের বাড়ী ত্যাগ করেছিলেন—সেই তার শেষযাত্রা ছিল।

বোরখার আড়ালে তিনি অপরূপ সজ্জিতা। দামী জামা। সিল্কের 'বাদিয়া'। গলায় সোনার হার পেচানো। কানে ঝুমকো এবং দুই হাত ভর্তি সোনার চুরি। তিনি ফেজ রওয়ানা হয়েছেন। সেখানে তিনি পিতার কবর জিয়ারত করবেন। পরে পবিত্র মক্কায় পৌঁছবেন। এই তাঁর তীর্থযাত্রা।

তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আছে। বুকে কম্পন জাগছে। বুঝতে পারলাম তিনি খুব অসুবিধে ভোগ করছেন। বাসটা খুব তাড়াতাড়ি

তাঁকে সেই স্থানে নিয়ে যাচ্ছে যে স্থান তিনি প্রায় বিশ বছর আগে ছেড়ে এসেছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছে যে, মৃত্যুর আগে তিনি ফেজে তাঁর মৃত পিতার কবর জিয়ারত করবেন এবং পরে পবিত্র মক্কা পৌঁছবেন। তাঁর পিতা স্বপ্নের মাধ্যমে ফজরের নামাজের কিছু আগে ঠিক এইরূপ বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এখন তাঁর শ্বেত প্রাসাদ, সজ্জিত বাড়ী থেকে অনেক দূরে। পাশে কেবল জুলিয়াস যার পায়ের নীচে গ্যাসের পেডেল।

আন্দন ?

সম্ভবতঃ তিনি আনন্দে আত্মহারা। এই হাওয়া যেন তাঁর কাছে নয়া হাওয়া। সামনে, পেছনে দুই পাশে অসংখ্য যাত্রী। যে জায়গা তিনি একদিন ছেড়ে এসেছেন সেখানে হয়তো কতো সুন্দর ঘর উঠেছে, নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে। নতুন মানুষ। নতুন জীবন। বিচিত্র দৃশ্য। তিনি উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করলেন। যেন ধ্যানের মধ্যে দেখলেন তাঁর বাবার ডান হাতটা। ঠিক ফজরের নামাজের আগে স্বপ্নে যেরকম দেখেছিলেন। তারপর সব অদৃশ্য।

জুলিয়াস একটা দৈত্য। বাসটাও যেন উদ্ভট যন্ত্র-জানোয়ার।

মা এখন দুর্ঘটনা কামনা করছেন। কারণ পবিত্র কোরানে আছে: 'যে ব্যক্তি তীর্থযাত্রায় মারা যায় তার জন্যে বেহেশ্‌তের দ্বার খোলা।

হঠাৎ জুলিয়াস ব্রেক চাপলো। চেয়ে দেখলাম আমরা কাস্‌টম-চেকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

ঘুমজড়ানো অবস্থায় কাস্‌টম বিভাগের দারোগা টলতে টলতে এসে গাড়ীর দরজা খুললেন। তাঁকে যে সাহায্য করলো সেও একই বিভাগের নিম্নতম কর্মচারী। দারোগার কাঁধে ঝুলানো পিস্তল। দ্বিতীয়জনের কোমরে চামড়ার বেল্ট। তাঁদের পেছনে দেখা

গেলো একদল আরব মিলিটারী। দুষ্টদেরকে দমন করার জন্যে সরকার বাহাদুর তাদেরকে নিযুক্ত করে রেখেছেন।

জানালার কাঁচ নামিয়ে শুকনো হাওয়া নিয়ে আমি ফুস ফুস ভর্তি করিলাম। মাথাটা নিচু করে চেয়ে দেখি দু'টো মোটরগাড়ী; একটা আর একটাকে পেছনে রেখে ছুটে আসছে। গাড়ীর মাথায় তিন রঙের নিশান পত পত করে উড়ছে।

'কয়টা মুরগী?' দারোগা সাহেব প্রশ্ন করলেন।

'বিশটা।' জুলিয়াসের উত্তর।

জুলিয়াস মাথার টুপিটা নামিয়ে ধুলো ঝাড়ার জন্যে পাশের চাকায় বাড়ি মারলো। তার চোখ দু'টো লাল। মুখে অসস্তিকর ভাব। সে তখন মুক্তির উপায় খুঁজছে।

'বিশটা মুরগী? এত কেন? দারোগা বিস্ময় ছড়ালেন।

'এত? কিজন্যে বলছেন! খাজনার জন্যে, না কিসে?' জুলিয়াস বললো।

'আচ্ছা, দেখা যাবে।' বলে দারোগা নিশ্চুপ।

'ভালো কথা। কতজন যাত্রী?' প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দারোগা আবার প্রশ্ন করলেন।

'ষাটজন। বিয়াল্লিশ জন বসে। বাকী সব দাঁড়িয়ে। দুজন 'মারু দম্পতি ছাড়া। ওরা উপরে ··এবং আমি।' জুলিয়াস বললো।

'অনেক যাত্রীত।' দারোগার উক্তি।

'অনেক কি জন্যে বলছেন? বেশী ভাড়ার জন্যে নাকি?' জুলিয়াসের উত্তর।

'আচ্ছা, দেখা যাবে।' দারোগা আবার নিশ্চুপ।

'ভালো কথা, ও টিনগুলো কিসের? কয়টি? অন্য প্রসঙ্গ টেনে দারোগা সাহেব দুটো হাত একত্র করে ঘষলেন। শান্ত এবং বুদ্ধিমানের মতো সেই ঘষা।

একদিন শুভ মুহূর্তে তিনি চাকরি পেয়েছেন। কাস্‌টমস্‌ বিভাগ খুশী হয়ে তাকে প্রমোশনও দিয়েছে। তারপর রোদ বৃষ্টি ঝড়ে এই কাজ।

'সাতটি টিন।' জুলিয়াস বললো।

'ওগুলোর ভিতরে কি আছে? দারোগার প্রশ্ন।

'বারুদ।' জুলিয়াসের উত্তর।

'বারুদ?' দারোগা সাহেব অবাক।

'হ্যাঁ, বারুদ। সেবুর নাগরিক হিসেবে এ সবের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।' বলেই জুলিয়াস তার পরিচয়-পত্র দারোগার সামনে হাজির করলো।

তিনি তা ভালো করে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে দারোগা সাহেব হুকুম দিলেন, 'যাও।'

জুলিয়াস এবার মাথার টুপিটা ঘুরিয়ে বসালো। ষ্টেয়ারিং হুইল ধরে নির্মমভাবে গাড়ী ছাড়লো। সে জয়ী। কাস্‌টম্‌-চেক তাকে আটকাতে পারে নি।

সামনে রাজপথ। সে রাজা হয়ে জন্মনি তবু তাকে আজ রাজা বলেই মনে হয়। কত ছলাকলাই না সে জানে! কী ফাঁকিটাই না দিল সে কাসটম বিভাগের কর্মচারীদেরকে। আনন্দের আতিশয্যে নিজের গলাটা সামনের দিকে বাড়ালো। একদা সে শিয়ালের দলে শিয়াল ছাড়া কিছুই ছিল না। আর শিকার ছিল মৃত জন্তু, পচা

মাংস। আর এখন? সে যেন মেষপালের মধ্যে একটা ব্যাঘ্র। আহ্ সততার কি দাম আছে পৃথিবীতে।

সূর্যের সুবর্ণ আলো চারদিকে উপচে পড়ছে। মাঠের বিস্তৃত পরিধিটা মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট স্বচ্ছ আয়না। চারপাশের ঘন কালো বৃক্ষরাজি সেই আয়নার সীমানা নির্দেশ করে আছে। ঘর নয়। বাড়ী নয়। তবু সুন্দর।

আমি জুলিয়াসকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। পরক্ষণেই তাকালাম সেই পত্রিকা পড়ায় রত পাশের লোকটির প্রতি। লোকটি তখনও নিবিষ্টমনে পত্রিকা পড়ছে। তার মুখে কোন শব্দ নেই, কেবল ঘন ঘন ঠোঁট নড়ছে। আশ্চর্য! আসলে লোকটা মোটেই পড়তে জানে কি না সন্দেহ হলো।

'আচ্ছা ভাই, কোনো নতুন খবর টবর আছে নাকি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লোকটি আমার দিকে তাকালো। ছোট্ট করে কাশি দিল। আবার পত্রিকায় ডুবে গিয়ে বিড় বিড় করতে লাগলো। খুব দ্রুত। মুখটা উঠিয়ে পরে বললো, 'প্রতিদিনকার মতই খবর। কেন, তুমি কি পত্রিকা পড়তে জানো না? কখনো পড়ো?

'না।' ধীরভাবে উত্তর দিলাম।

'বড়ই আক্ষেপ!' লোকটি দুঃখ প্রকাশ করলো।

খুব শান্তভাবে তার কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়ালাম। যাই হোক, ধরে নিচ্ছিলাম লোকটা পড়তে পারে অর্থাৎ লেখাপড়া জানে। কিন্তু আমার সন্দেহটা স্পষ্ট হলো কাঁচের মাঝখান দিয়ে জুলিয়াস যখন আমার দিকে চেয়ে হাসলো।

আমিও না হেসে থাকতে পারলাম না।

'দেখো, যদি হাজী ফাতেমী ফারদীর পুত্র কোনদিন তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে তবে কি তা পূর্ণ করতে আসবে?' জুলিয়াসকে বললাম।

'নিশ্চয়। আপনি আমাকে প্রতি সন্ধ্যায় বাশ্‌বিরে দেখতে পাবেন। খোঁজ নেবেন।" জুলিয়াস উত্তর দিল।

'বাশ্‌বির!' বিশ্রী জায়গাটার নাম শুনে আঁতকে উঠলাম।

যদিও সামনের রাস্তাটা জনশূন্য ছিল জুলিয়াস জোরে জোরে গাড়ীর হর্ন বাজাতে লাগলো।

তারপর সিটে ফিরে এসে পত্রিকা পড়া রত লোকটির কাছে পত্রিকাটি চাইলাম। সে উল্টে পাল্টে ভালো করে তা পড়লো অর্থাৎ ঘ্রাণ নিলো এবং হঠাৎ পত্রিকাটি ভাঁজ করে গুটিয়ে বগলের নীচে রেখে মুখ ঘুরালো।

'ফেজ কত দূর?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

তাড়াতাড়ি মার কথার জবাব দিতে পারলাম না।

যে পবিত্র স্থানে আমরা যাচ্ছি তার যাত্রাপথই এত সব নোংরামিতে ভরা! তবে আমরা পবিত্রতায় পৌঁছাবো কি করে? পবিত্র রাস্তা না হলে পবিত্র স্থানে কি করে যাওয়া যায়? মার কাছ ঘেষে ভালো করে বসে মার কানের কাছে বললাম, 'মক্কাতো দূরের কথা, ফেজই এখনো অনেক দূরে, মা।'

বাংলাদেশ

লেখক-পরিচিতি

মাহমুদ তাইমুর

সাহিত্যিক বাবা-মা, ফুফু, ভাই-বোন নিয়ে মিশরের যে তাইমুর পরিবার বিশ্ব-বিখ্যাত সেই পরিবারে মাহমুদ তাইমুর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাবা আহমদ তাইমুর, ভাই মুহম্মদ তাইমুর এবং ফুফু আয়েশা তাইমুর আন্-নাহদা বা রেনেসাঁ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আরবী সাহিত্যের ক্লাসিকধর্মীতা অপসারণ করে আরবী সাহিত্যকে নবরূপ দানে আত্মনিয়োগ করেন।

মাহ্মুদ তাইমুর শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেন নি। ফরাসী ও রুশ ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল সমপরিমাণে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে শিক্ষাগ্রহণকালে তিনি ফরাসী ও রুশ ভাষা আয়ত্ত করেন। এবং এ কারণেই তাঁর রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসী লেখক মোপাসাঁ এবং রুশীয় লেখক চেকভ ও তুর্গেনিভের প্রভাব বর্তমান। এমনকি মাহ্মুদ তাইমুরকে আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁও বলা হতো। অবশ্যি, পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁদের প্রভাব কাটিয়ে উঠেন।

সাহিত্যকৃতির সম্মান স্বরূপ ১৯৫০ সালে তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া ১৯৫১ সালে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আদরাঙ্গলুল কারিয়া' (গ্রামের কাহিনী) ফরাসী ভাষায় অনুবাদের পর ফরাসী সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

মাহ্মুদ তাইমুর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এমন মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন যা যে-কোন দেশের সুধীসমাজ কর্তৃক আদৃত হবার

যোগ্য। নিজস্ব ভঙ্গী ও স্বকীয়তার জন্য মাহ্‌মুদ তাইমুর আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে এমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন যাকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে।

আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মাহ্‌মুদ তাইমুরের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'আবুল হোল ইয়াতির', 'ইবনে জ্বালা', 'আ'লামুল মুহেনদেসীন ফিল ইসলাম', 'আবুল শাওয়ারেব', 'দুনিয়া মাদিদাতু', 'সালওয়া ফি মুহেব্বের রীহ্', 'শাফাউর রূহ্', 'শাবাব ওয়াগানিয়াত', 'আতারা ওয়া দুখান', 'কাজেব ফি কাজেব', 'কুল্লু আমেন ওয়া আনতুম বিল খায়ের' এবং 'আন-নাবীউল ইসলাম' প্রধান।

জুন নুন আইয়ুব

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন জুন নুন আইয়ুব। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্কুল শিক্ষক। শিক্ষকতার অন্তরালে সমাজ জীবনের এমন খুঁটিনাটি ঘটনা এবং অন্যায় আচরণের সন্ধান তিনি পেয়েছেন যা সমাজ-শরীরে দুষ্ট ক্ষত ছাড়া কিছুই নয় এবং সেসবই লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'আদ্ দাকতোর ইবরাহীম' (ডক্টর ইবরাহীম) উপন্যাসটির নাম করা যায়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আরব জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীর কয়েকটি ভাষায় এর অনুবাদ হয়।

শিল্পের জন্য শিল্প বা 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই মতবাদে আইয়ুব বিশ্বাসী নন। যে শিল্প বা সাহিত্যে নির্যাতিত বা সাধারণ মানুষের কথা বা প্রতিচ্ছবি থাকে না সে শিল্প সাহিত্য বা জীবন পূর্ণাঙ্গ নয়। এই নীতি প্রচারকল্পে তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং জনগণের মুখপত্র হিসেবে এর নামকরণ করেন 'আল্-মাজাল্লা' (সবার পত্রিকা)। আশার কথা, অল্পদিনেই এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং আইয়ুব মতবাদী একটি সাহিত্য গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই ধারায় যাঁরা সাহিত্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে ইরাকের প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবদ আল্ মালীক, আবদ আল্ লতীফ

নূরী, 'আল রায়য়ী আল্ আম' (যুগের কৃষক) পত্রিকার সম্পাদক সালীম তাহা আল তিকরিতী এবং মুহম্মদ মাহদী আল জওয়াহারী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায়ই জুন নুন আইয়ুব নিজেকে বেশী ব্যাপৃত রেখেছেন। তাঁর ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে 'সাদিকী' (আমার বন্ধু), 'বুরুজ বাবেল' (বাবেলের চূড়া), 'আল কাদিবুন' (নিম্নশ্রেণী), 'আল হুমায়্যাত' (অসুখ) ইত্যাদি খুবই উল্লেখযোগ্য।

নিরলস সাহিত্যসাধনা ছাড়াও জুননুন আইয়ুব বিভিন্ন সাহিত্যসংঘ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। তাঁর 'আদ দ্‌কতোর ইবরাহীম' উপন্যাসটি সম্প্রতি চলচ্চিত্র রূপ পেয়েছে।

নাজীব মাহফুজ

মিশরের আল-কাহেরা (কায়রো) শহরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিপ্লোমা গ্রহণের পর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন পরিচালনা বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি কিছুদিন মিশর আইন সভার ওয়াক্‌ফ মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর পদও অলঙ্কৃত করেন।

প্রথমতঃ তিনি আরবী সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

তাঁর রচনার মূল উপজীব্য স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম এবং জীবনবাদ। গত বিশ্বযুদ্ধে মিশর যে অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং যুদ্ধশেষে মিশরের উত্থান ও স্বাধীনতা সুখ সম্পর্কিত তাঁর বারো শ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাস 'বায়নাল কাসরাইন' (দুই প্রাসাদের মাঝখানে) আধুনিক আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বলা যায় যে, নাজীব মাহফুজের সমসাময়িক লেখক তাওফীক আল্-হাকীম একই

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস 'আওদাতের রুহ্' (আত্মার প্রত্যাবর্তন) রচনা করেন এবং এই দুটো উপন্যাসই স্বাধীনতা-উত্তরকালের মিশরের সমাজ-জীবনের পুনরুত্থানের অগ্নিফসল।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নাজীব মাহফুজের অবদান নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর রচনায় সমাজ-জীবনের পূর্ণচিত্র ছাড়াও দর্শনতত্ত্বের আভাস লক্ষ্য করবার মতো। তাছাড়া রাজনৈতিক সমস্যার চিত্রও তাঁর রচনায় বিদ্যমান।

১৯৫৭ সালে তাঁর অমর উপন্যাস 'বায়নাল কাসরাইন'-এর জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য ছোটগল্প সংকলন এবং উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বাদাইয়াত ওয়া নেহাইয়াত', 'খানা আল-খালিলী', 'রা'দওয়া বিস্', 'রাফাক আল্ মাদ্ক,' 'আস্-সারার' আল্-সুক কারিয়া', 'আবাসা আল্-আবাদার', 'আল্-কাহেরাতুল জাদিদাহ্', 'কাসরুল শাওক,' 'কিফাহ্ তায়্যেবাহ্,' 'হামাসাল্ জুনুন' প্রভৃতি।

মননশীল সাহিত্য-রচনা ছাড়াও তিনি নিয়মিত 'সাওতুল কাহেরা' (কায়রো বেতার)-এর নিয়মিত ফিচার-লেখক এবং সিনেমার গল্প লেখক। তাছাড়া তিনি মিশর সাহিত্য সমিতির সভ্য এবং 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সংস্থা, মিশর শাখার একজন কর্মকর্তা।

তাঁর বেশসংখ্যক গল্প ও উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে।

ইউসুফ আল্ সাবায়য়ী

মিশরের বিখ্যাত আল্ সাবায়য়ী পরিবারে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ইউসুফ আল্ সাবায়য়ী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহম্মদ আল্-সাবায়য়ীও একজন প্রতিভাবান লেখক ছিলেন।

স্কুলজীবন থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় এবং তখন থেকেই তিনি নিয়মিত লিখে আসছেন। কায়রোর ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বাধ্যতামূলকভাবে অশ্বারোহী

সেনাদলে যোগদান করেন এবং কর্মদক্ষতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই অশ্বারোহীদলের অধিনায়ক পদে উন্নীত হন। সামরিক জীবনের কঠিনতম কাজ পরিচালনা করেও তিনি একটি সামরিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

সামরিক জীবন থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি মিশর আইনসভায় যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি মিশরের শিক্ষামন্ত্রী পদে বহাল আছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যসংস্থার সঙ্গেও তিনি জড়িত।

ইউসুফ আল্ সাবায়য়ী একাধারে প্রগতিশীল ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। প্রাচীন ক্লাসিকধর্মী গদ্যরীতির অবসান ঘটিয়ে নূতন ষ্টাইলের গদ্যরীতিতে তিনি বিশ্বাসী। এবং এ কারণেই তাঁর রচনায়, অন্ততঃ ষ্টাইলের দিক দিয়ে পশ্চিমী প্রভাব প্রকট।

তাঁর রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন পক্ষপাতিত্ব তাঁকে পীড়িত করেনি। সমাজের 'সানাতা আশরাতা ইমরাতিন' বা 'দশজন নারীর প্রশংসায়' তিনি যেমন মুখর তেমনি 'আসনা আশারা রেজালুন' বা 'দশজন পুরুষের গুণকীর্তন' করতেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। এবং এ কারণেই ইউসুফ আল্ সাবায়য়ীর জনপ্রিয়তা এত প্রচুর। তাছাড়া তাঁর রচনায় রসাত্মক ভঙ্গীও লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর অন্যতম সুবৃহৎ উপন্যাস 'রুদ্দুল্ কালবি' (মানসিকতার পরিবর্তন) সেই পরিচয়ই বহন করে।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে কথাসাহিত্য তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানে সমৃদ্ধ। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তন্মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করছি। যেমন, 'আতিয়াফ', 'সানাতা আশারাতা ইমরাতিন', 'আসনা আশারা রেজালুন', 'আরদুন নাফাক', 'আগানিয়াত উম্মুর রাতিবাত', 'আতিন রাহেলাতা', 'আইয়্যামে তামের', 'বায়না আবু রিশ ওয়া জানিনাতা না' মিশ', 'বায়নাল আতলাল', 'আল বাহাসা আনেল জাসাদ', 'জামিয়াত কাতালা আয-যাওয়াত', 'হুব্বা ইয়াস সোদুর', 'আস্-সাকাফাত', 'সামারাল লায়ালী', 'সেততু নিসায়ু ওয়া সেততু রেজালু', 'সাওরো তাবাকাল আসাল', 'ফি মাওয়াকাবেল্ হাওয়া', 'লায়লাতুল খামার', 'লায়াল ওয়া

দুমুয়ু', 'মিন হায়াতী', 'মিনাল আ'লামেল মজহুল', 'মারকা বাল আ'শাক' নায়েবে আজরাইল', 'হাজিহিন্ নুফূস'' 'হাজা ওয়া হুববু', 'হাজিহিল হায়াত', 'ইয়া উম্মাতি জাহেকাত', ইত্যাদি।

তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস যেমন 'রুদ্দুল কালবি', 'হাজা ওয়া হুব্বু', 'হাজিহিল হায়াত' প্রভৃতি চলচ্চিত্ররূপ পেয়েছে।

ইউসুফ শারোনী

মিশরের মানুক শহরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ শারোনী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভের পর তিনি ইউরোপীয় অঞ্চলে বিদেশী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে ফরাসী ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে সুদান সরকারের অধীনে জনশিক্ষা বিভাগে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি এই পদেই বহাল আছেন।

ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক সমস্যা ছাড়াও আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতা কিংবা যৌন আবেগও যে আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যিকদের রচনার প্রতিপাদ্য তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ ইউসুফ শারোনীর বলিষ্ঠ রচনাসমূহ।

ইউসুফ শারোনীর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যৌনলিপ্সার আর্তি থাকলেও তা ঘৃণিত এবং অবজ্ঞেয়। ঘৃণা, অবজ্ঞা, অনীহা ইত্যাদিকে ম্লান করার পশ্চাতে লেখকের যে শ্রম তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রূপক, প্রতীকধর্মীতা এবং সর্বোপরি সত্যের আলো—ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অনীহার স্তূপের উপর এমন ভাস্বর যে, শেষ পর্যন্ত সেই আলোকই সবার কাম্য, মিথ্যা বা 'বাতিল' কারও অভিপ্রেত নয়। তাই ইউসুফ শারোনী যেখানে 'কায়ফা ইয়া তাখাল্লাসুল বাতিল' (কি করে অন্ধকার উন্মোচিত) গল্পে আলোর চাবিকাঠি দিয়ে অন্ধকারের তালা খুলতে পারেন তেমনি অন্ধকার নোংরা গলির নোংরা মানুষের মধ্যে ('দারব দারাইব') মনুষত্বের আলো জেলে তাকে সত্যিকার মানুষরূপে সৃষ্টি করতে পারেন। এই সৃজনশীলতাই সার্থক শিল্পীর বৈশিষ্ট্য।

ছোটগল্প-লেখক হিসাবেই ইউসুফ শারোনীর খ্যাতি সুবিদিত। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশোত্তর কালে যাঁরা আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যে বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর একেঁছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'খাত ইলা ইমরাতিন্' (মহিলার কাছে চিঠি) খুবই উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিভিন্ন সাহিত্যসংঘ কিংবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িত। ১৯৫৮ সালে আল-কুয়েত-এ অনুষ্ঠিত সাহিত্যসম্মেলনে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাহিত্যগোষ্ঠীর তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। তাছাড়া কায়রোতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আরবী সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সচিবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইউসুফ ইদরীস

মিশরের আল্‌বিরুম নামক গ্রামে ১৯২৮ সালের ১১ই মে ইউসুফ ইদরীস্ জন্মগ্রহণ করেন। আল্ ফাকুস থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন যথাক্রমে দামিয়াত্তা ও আল্-থাকাজিজ থেকে। অতঃপর মিশরের কাসর আল-আইনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করে উক্ত কলেজসংলগ্ন হাসপাতালে চিকিৎসাবিদের পদ গ্রহণ করেন।

ইউসুফ ইদ্‌রীস শুধু চিকিৎসাবিদ নন, সাহিত্যেরও একজন খ্যাতিমান ডাক্তার; কারণ, সমাজ থেকে অন্যায় অবিচারের ক্ষত নিরাময় করার উদ্দেশ্যেই তাঁর বলিষ্ঠ হাত নিয়োজিত। তিনি আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতাকে উপলব্ধি করেছেন তাঁর অন্তঃদৃষ্টির নিরিখে, তাই তাঁর সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত উপন্যাস 'হাদেসাতু শারফ' (মঞ্চের কাহিনী) এই অভিজ্ঞতারই মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

হাসপাতালের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যেসব গল্প লিখেছেন তাতেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান। আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত 'মাসবুলিয়্যাত' বা 'দায়িত্ব' তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। লেখকের মানবতাবোধও যে খুব প্রবল এই লক্ষণও তাঁর রচনার সর্বত্র পরিস্ফুট।

গল্প লেখক হিসেবেই ইউসুফ ইদ্‌রীসের খ্যাতি সুবিদিত। বর্তমানে তিনি উপন্যাস, নাটক এবং সমালোচনা সাহিত্যেও আত্মনিয়োগ করেছেন। 'কিস্‌সাতুল হোব্বু' (প্রেমের কাহিনী) তাঁর সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত উপন্যাস। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে 'দা'উল আদাব' (সাহিত্যের আহ্বান) খুবই উল্লেখযোগ্য।

নিরলস সাহিত্যসাধনা ছাড়াও তিনি সাহিত্য সংস্থা, চিকিৎসক সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশ পরিভ্রমণ করে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তার প্রভাব তাঁর সাহিত্যকর্মেও বর্তমান।

ইদরীস শা'রাবী

মাজাগানের তরুণ কথাশিল্পী।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশোত্তর কালে যে কয়জন আরবী কথাশিল্পী বিশেষ খ্যাতির অধিকারী, ইদরীস্ শা'রাবী তাঁদের একজন। কি টেকনিক, কি বিষয়বস্তু, কি ষ্টাইল সবতাতেই ইদরীস্ শা'রাবীর বলিষ্ঠ হাত ক্রিয়াশীল। তাঁর রচনায় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতাকে উপলব্ধি করেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং অন্তঃদৃষ্টির আলোকে। এবং সেই আলোকের বর্ণচ্ছটাই তাঁর রচনায় দীপ্তিমান।

নতুন নতুন শব্দ, উপমা, বাক্যালঙ্কার এবং বিশেষণের সমারোহে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে ভাষাকে সুন্দর করার প্রবণতা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া সরল বাক্যের ব্যবহারও তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত 'আল্‌হাজ্জ' (তীর্থযাত্রা) গল্পটি তার অন্যতম প্রমাণ।

ইদ্‌রীস্ শা'রাবীর একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা এবং আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে আরবী কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধিতে সহায়ক।

স্ক্যান ও এডিট : গোলাম মাওলা আকাশ

একটি

থ্রিলার পাঠকদের আসর বই ঘর বইয়ের স্বর্গ বুক'স আর্কাইভ বিডি

আড্ডায় বইয়ের পাতা । Softcopy Boi Premi ফিকশন রিডার'স ক্লাব

ইসলামিক বই বাংলা বই

বইপড়ুয়াদের আনন্দমেলা Bangla Classic Books

বই চোর- BOOK THIEF আড্ডায় বইয়ের পাতা গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন বইপোকা ফাউন্ডেশন

বইপোকাদের আড্ডা BanglaPDF.net বইয়ের পোকা বই প্রেমী আমরা

ওয়েস্টার্নপাগল সংঘ বই এবং আড্ডা Boighar - বইঘর

ইসলামিক বুক লাভার'স বইপড়ুয়াদের পাঠাগার বাংলা বই Book Valley

বাংলা সাহিত্যের সিরিজ ভিত্তিক বই সমূহ Boi Poruya(বই পড়ুয়া) গ্রন্থাগার আমার বই (Book Lovers)

বইপাঠকের প্লাটফর্ম ই-বইপত্র ★বই বিলাস বইয়ের আসর

সেবা প্রকাশনী Tin Goyenda Fans United (TGFU) 25

বইয়ের হাট PDF BOOKS DOWNLOAD বইয়ের পৃথিবী শুধু আলো

আমরা গোয়েন্দা ভার্চুয়াল লাইব্রেরী - বাংলা বইয়ের সংগ্রহশালা মজলিশে বই পোকা

সাহিত্য প্রেমীদের আড্ডা বইপাগলের আখড়া প্রয়োজনীয়_বাংলা_বই

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট সায়েন্স ফিকশন ও ফ্যান্টাসি পড়ুয়া ফাউন্টেনপেন

The Books of Masud Rana series সাহিত্য ও আড্ডা হারিয়ে যাওয়া বই

রানা এজেন্সি বই পড়ুয়াদের চিলেকোঠা বই পাড়া

বই পড়ুয়া, বইয়ের পোকা, বই পাঠক সমাজ নন ফিকশন বই লাভারস,অনুবাদ সাহিত্যের দুনিয়া,

প্রচেষ্টা